

Vol. 28 | No. 1 | 1984

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশের উপন্যাস

Volume	28
Issue	1
Year	1984
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বিশ্বজিৎ ঘোষ
Published online	September 1, 1984
DOI	10.62328/sp.v28i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i1.5
Pages	131-186
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলাদেশের উপন্যাস

বিশ্বজিৎ ঘোষ

উপন্যাস হচ্ছে আধুনিকতম এবং সমগ্রতাস্পর্শী সেই শিল্প-প্রতিমা, যেখানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় জীবনের আদি-অন্ত; শিল্পিত স্বরগ্রামে উদ্ভাসিত হয় লেখকের জীবনার্থ আর তাঁর স্বদেশ-সমাজ-সমকাল। বুর্জোয়া সমাজের শক্তি এবং স্বাতন্ত্র্যে আত্মস্থ হয়ে, মধ্যযুগীয় জীর্ণ সামন্ত-সমাজকাঠামো ভেঙ্গে দেয়ার অভীপ্সা নিয়ে, উপন্যাসের জন্ম। নবোত্থিত শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং বুর্জোয়া-সেবিত সমাজই উপন্যাসের আদি-জনয়িতা। আধুনিক যুগে সমাজ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিমানুষের যে সংগ্রাম—তারই মহাকাব্যিক রূপ উপন্যাস। এ-প্রসঙ্গেই স্মরণীয় Ralph Fox-এর সেই উদ্ধরণযোগ্য উক্তি :

> The Novel is the epic-form of our modern, bourgeois society.··· It did not exist, except in very rudimentary form before that modern civilisation which began with the renaissance and like every new art-form it has served its purpose extending and deepening human consciousness.[১]

অবক্ষয়িত সামন্তসমাজকে ভেঙ্গে দিয়ে ষোল-সতের শতকে ইউরোপে নতুন অর্থনৈতিক-শ্রেণী এবং সামাজিক-শক্তির জন্ম হলো এবং তখনি ঘটলো আধুনিক রূপকল্প উপন্যাসের আবির্ভাব। উনিশ শতকের প্রারম্ভেই কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর বিকাশ ঘটে; শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নবজাগ্রত এই মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর হাতেই বাংলা উপন্যাসের অঙ্কুরোদ্গম। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে পূর্ববঙ্গের মুসলিম মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর বিকাশ হয়েছে শতবর্ষ বিলম্বিত। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১) পূর্ববঙ্গের মুসলিম মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর বিকাশে রাখে

ঐতিহাসিক অবদান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ববাংলার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ নব্য-শিক্ষিতের সমবায়ে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই ক্রমবিকশিত হচ্ছিলো ঢাকা শহরকেন্দ্রিক নতুন মধ্যবিত্ত-শ্রেণী। পূর্ববাংলার নবজাগ্রত এই মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর চেতনা-স্নাত কয়েকজন শিল্পীর সাধনায় রচিত হয়েছে বাংলাদেশের উপন্যাসের প্রাথমিক ভিত্তি।

ঢাকা শহরকেন্দ্রিক নতুন মধ্যবিত্ত-শ্রেণী মর্মমূলে সামন্ত-মূল্যবোধ ধারণ করেও বুর্জোয়া সমাজ-সংগঠনের চিন্তা-চেতনা, উদার মানবতাবাদ এবং যুক্তিবাদে আকৃষ্ট হয়ে ১৯২৬ সালে গঠন করলো 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'। অপরদিকে মার্কসবাদে বিশ্বাসী অথচ বুর্জোয়া মানবতাবাদে আস্থাশীল লেখক ও শিল্পীরা গঠন করলো 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী-সংঘ' (১৯৩৯)। এই দুই সংগঠনের শিল্পীদের মানস-ভূমিতে পূর্ববঙ্গ উপ্ত করেছে স্বাতন্ত্র্যের বীজ; এবং এঁরাই স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীকে আধুনিক জীবন-চেতনায় অনেকাংশে উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রাক্-সাতচল্লিশ পর্বে আমাদের ঔপন্যাসিক-চেতনাপুঞ্জ প্রবাহিত হয়েছে দুটি ভিন্ন স্রোতে। একটি স্রোতের উৎসে ছিলেন সামন্ত-মূল্যবোধে বিশ্বাসী ঔপন্যাসিকরা; অন্যটি সৃষ্টি হয়েছে উদার বুর্জোয়া মানবতাবাদে প্রত্যয়ী কথাকোবিদদের সাধনায়। প্রথম স্রোতটি নির্মাণ করেছেন মোহাম্মদ নজিবর রহমান (১৮৭৮-১৯২৩), কোরবান আলী, শেখ ইদরিস আলী (১৮৯৫-১৯৪৫) প্রমুখ; আর দ্বিতীয়টি কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আকবরউদ্দীন (১৮৯৫-১৯৭৮), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) এবং হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯)। তবে এ-ক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে, অসম সমাজ-বিকাশের কারণে বিশ শতকের সূচনাকাল থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত মুসলিম মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর মানসলোকে বুর্জোয়া ভাবধারার ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল এবং সত্যসন্ধ। কারণ 'যতক্ষণ বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে সংঘর্ষরত, সে-পর্যন্ত বুর্জোয়া চেতনা-প্রবাহ সত্যসন্ধ।'[২]

নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' (১৯১৪), 'প্রেমের সমাধি' (১৯১৯) এবং 'গরীবের মেয়ে' (১৯২৩) উপন্যাসত্রয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক

এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে পূর্ববাংলার বিকাশমান মুসলিম-সমাজের জীবনভাবনা এবং জীবনবিশ্বাসের বিশ্বস্ত শিল্প-প্রতিমা। 'আনোয়ারা'র নুরল এসলাম, 'প্রেমের সমাধি'র মতিয়র রহমান এবং 'গরীবের মেয়ে'র নুর মহম্মদ—এই তিন নায়ক-চরিত্রের আচার-আচরণ-উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক মূলতঃ ধরতে চেয়েছেন সমকালীন মুসলিম-সমাজের প্রত্যাশা-প্রাপ্তি, আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন-সংগ্রাম এবং সংশয়-সংকটের আলেখ্য। এ-কথা অনস্বীকার্য যে, নজিবর রহমানের সকল উপন্যাসের অন্তর্স্রোতেই প্রবাহিত হয়েছে সামন্ত-মূল্যবোধের প্রতি তাঁর সহজাত আকর্ষণ। 'আনোয়ারা' উপন্যাসে লেখক তাঁর সবটুকু মনোযোগ ব্যয় করেছেন সতীত্বের মহিমাকীর্তনে—যা একান্তই সামন্ত-মূল্যবোধজাত। তবে নুরল এসলামের আর্থিক-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশের কথাই পরোক্ষ অভিব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। লেখকের ইঙ্গিত অনুভবসঞ্চারী :

> এইরূপে নুরল এসলাম বাণিজ্য প্রাসাদাৎ অল্প সময় মধ্যে ধনকুবের হইয়া উঠিলেন। অর্থাগমের সহিত তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসন দ্বিতল-সৌধরাজিতে শোভিত হইল। নুরল এসলামের অর্থ-সাহায্যে ও স্বজাতিপ্রিয়তায় গ্রামের দুঃস্থ লোকগণের সুখ-সন্তোষ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি দরিদ্র লোকের শিক্ষার জন্য স্বগ্রামে অবৈতনিক মাইনর স্কুল খুলিয়া দিলেন।[৩]

'প্রেমের সমাধি', 'গরীবের মেয়ে', 'পরিণাম' কিংবা 'হাসনগঙ্গা বাহমনী'তে নজিবর রহমান 'আনোয়ারা'র জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে ব্যর্থ হলেও, পূর্ববাংলার উপন্যাস-সাহিত্যের ভিত্তি-নির্মাণে ওগুলোর ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর নয়। মোহাম্মদ কোরবান আলীর 'মনোয়ারা' (১৯২৫) এবং শেখ ইদরিস আলীর 'প্রেমের পথে' (১৯২৬) নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' এবং 'প্রেমের সমাধি' উপন্যাসের দুর্বল অনুকরণ মাত্র। 'আনোয়ারা'র মতোই 'মনোয়ারা' এবং 'প্রেমের পথে' উপন্যাস পতি-ভক্তির মহিমাকীর্তনে সমাপ্ত হয়েছে।

আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যে কাজী ইমদাদুল হক হচ্ছেন সেই শিল্পী, যিনি উপন্যাস রচনায় প্রথম মনোযোগী হলেন সমকালের প্রতি। তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত, উদার মানবতাবাদী, মননশীল এবং যুক্তিবাদী

শিল্পদৃষ্টি-সম্পন্ন ঔপন্যাসিক। তাঁর 'আবদুল্লাহ্' (১৯৩৩) উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে গ্রামীণ মুসলিম-সমাজের পীরভক্তি, ধর্ম-সংস্কার, পর্দা-প্রথা, আশরাফ-আতরাফ বৈষম্য— ইত্যাদির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া মানবতাবাদী প্রতিবাদ। 'আনোয়ারা'র মতো এটিও সমকালীন মুসলিম জীবনবিশ্বাসের শিল্পিত ভাষ্য। তবে 'আনোয়ারা'র ঘটনাসংস্থান কিংবা চরিত্রচিত্রণ প্রক্রিয়া যেখানে স্রষ্টার ব্যক্তিগত আদর্শ এবং নীতিবোধ-নিয়ন্ত্রিত, সেখানে 'আবদুল্লাহ্'র ঘটনাংশ, চরিত্রসৃজন-কৌশল কিংবা পরিপ্রেক্ষিত-উন্মোচন একান্তই মানবতা-শাসিত। মধ্যবিত্তের বিকাশের ফলে মুসলিম-সমাজের ভিত কিভাবে নড়ে উঠেছে তার চিত্র আছে, আছে গ্রামীণ-সমাজের নানা-মাত্রিক জটিলতা; তবু স্রষ্টার ধর্ম-নিরপেক্ষ উদার-মানববাদী দর্শনই 'আবদুল্লাহ্' উপন্যাসের মৌল-অভিজ্ঞান। কেন্দ্রীয় চরিত্রের দৃষ্টিকোণে লেখকের বক্তব্য অনুধাবনীয় :

> আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা মানুষ হও, প্রকৃত মানুষ হও——যে মানুষ হ'লে পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা কত্তে ভুলে যায়, হিন্দু মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে আপনার জন বলে মনে কত্তে পারে। এই কথাটুকু তোমরা মনে রাখবে ভাই,——অনেকবার তোমাদের বলেছি, আবার বলি, হিন্দু-মুসলমানে ভেদজ্ঞান মনে স্থান দিও না। আমাদের দেশের যত অকল্যাণ, যত দুঃখ-কষ্ট এই ভেদ-জ্ঞানের দরুণই সব। এইটুকু ঘুচে গেলে আমরা মানুষ হতে পারব—দেশের মুখ উজ্জ্বল কত্তে পারব।[৪]

পূর্ববাংলার চর-অঞ্চলের মুসলিম কৃষক-সমাজের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা আর আশা-নিরাশার চালচিত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে কাজী আবদুল ওদুদের 'নদীবক্ষে' (১৯১৯)। মতি আর লালুর প্রেমের রোম্যান্টিক-পটে এখানে উন্মোচিত হয়েছে সমান্ত-সমাজের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত মধ্যবিত্তের ভাববাদী প্রতিবাদ——যা কাজী আবদুল ওদুদের জীবনার্থের মৌল-সত্য। 'নদীবক্ষে' উপন্যাস সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) মন্তব্য এখানে স্মরণীয়—— "আপনার লিখিত "নদীবক্ষে" উপন্যাসখানিতে মুসলমান চাষী গৃহস্থের যে সরল জীবনের ছবিখানি নিপুণভাবে পাঠকদের কাছে খুলিয়া দিয়াছেন তাহার স্বাভাবিকত্ব, সরসতা ও নূতনত্বে আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি···।"[৫]

কল্লোলিত পদ্মার তীরবর্তী সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনধারা নিয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছে হুমায়ুন কবিরের 'নদী ও নারী'। এ-উপন্যাসে একটা প্রাণময় অস্তিত্ব-ঘোষক চরিত্র হিসেবে নদীর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। পদ্মার নিষ্ঠুর বৈরিতার বিরুদ্ধে তার তীরবর্তী মানুষেরা মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়, আপন অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়াস পায়; কিন্তু নির্মম পদ্মা, গ্রীক-ট্রাজেডির অমোঘ নিয়তির মতো, মানুষের স্বপ্নকে দেয় ভেঙে। তবু প্রমত্ত পদ্মার প্রতিবেশী সংগ্রামী আর স্বাপ্নিক নজু মিয়া-আসগর-বসির-মালেক-কুলসুম-নুরু কখনো মাথা নত করে না; পদ্মার ভাঙনে সর্বস্বান্ত হয়েও তারা আবার নতুন আশার স্বপ্ন বোনে, পাড়ি জমায় সুদূরে ভেসে ওঠা কোনো-এক সোনালি-রূপালি দ্বীপে।

যেমন কাজী আবদুল ওদুদ কিংবা ইমদাদুল হকের উপন্যাস, তেমনি হুমায়ুন কবিরের 'নদী ও নারী'ও ভাববাদী মানবতা-চঞ্চল জীবনদৃষ্টির শিল্প-প্রতিমা। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, 'নদী ও নারী' উপন্যাসে হুমায়ুন কবিরের সর্বজ্ঞ-সহানুভূতি বর্ষিত হয়েছে স্বচ্ছল কৃষিজীবীদের প্রতি; জীবনাচরণের-দৃষ্টিতে কৃষক হলেও সম্পত্তি-বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে তারা অকপটেই উন্মোচন করে দিচ্ছে তাদের সামন্ততান্ত্রিক মনোবৃত্তি। তবু একথা মানতেই হবে, আশাবাদে প্রত্যয়ী হুমায়ুন কবির মূলত নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভাবসত্যময় আবেগ-জীবনেরই রূপকার।

বিপরীতধর্মী দুই সামাজিক-শ্রেণীর বিরোধের পটভূমিতে বিন্যস্ত এবং জনৈক লতিফ দারোগার বিপর্যস্ত জীবন-কাহিনীকে আলম্বন করে রচিত আকবরউদ্দীনের 'মাটির মানুষ' (১৯৩১) উপন্যাসে অভিব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে বিশ শতকের প্রথম দিককার গ্রাম-বাংলার স্থিরচিত্র আর চলচ্চিত্র। চরিত্র-চিত্রণ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বিচারে আকবরউদ্দীনের 'মাটির মানুষ' বিভাগ-পূর্ব কালের একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম।

তিরিশের পশ্চিমবঙ্গীয় উপন্যাসের প্রকরণ-কৌশল এবং মনোবিশ্লেষণ রীতিকে অঙ্গীকার করে এ-পর্বেই ঘটে আবুল ফজলের দীপ্র আবির্ভাব। 'কল্লোল' (১৯২৩)-'কালিকলম' (১৯২৬)-'প্রগতি'র (১৯২৭) ঔপন্যাসিকদের হাতে বাংলা সাহিত্যে যে নাগরিক-চেতনার উদ্বোধন, আবুল

ফজলই প্রথম তা আমাদের উপন্যাসে অঙ্গীভূত করলেন; এবং এ-অর্থেই তিনি পূর্ববাংলার কথাসাহিত্যে এক নতুন মাত্রার জনয়িতা। 'চৌচির' (১৯২৭), 'প্রদীপ ও পতঙ্গ' (১৯৪০) এবং 'সাহসিকা' (১৯৪৬) উপন্যাসে তিনি মনোবিশ্লেষণ-রীতিতে উপস্থিত করেছেন মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন-চেতনা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে মুসলিম মধ্যবিত্ত-মানসের মৌল-লক্ষণ সমাজবিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং একই সাথে সমাজ-সংশ্লিষ্ট কর্মচেতনা 'চৌচির' উপন্যাসের নায়ক তসলিম চরিত্রের মধ্য দিয়ে শিল্পমূর্তি লাভ করেছে।[৬] এ-প্রসঙ্গেই স্মরণীয় 'চৌচির' সম্পর্কে আবুল ফজলের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য :

> আপনার 'চৌচির' গল্পটি আমার দৃষ্টিকে ক্লিষ্ট করেও পড়েছি। আমার পক্ষে এ গল্প বিশেষ ঔৎসুক্যজনক। আধুনিক মুসলমান সমাজের সমস্যা ঐ সমাজের অন্তরের দিক থেকে জানতে হলে সাহিত্যের পথ দিয়েই জানতে হবে—এই প্রয়োজন আমি বিশেষ করেই অনুভব করি। আপনাদের মতো লেখকদের হাত থেকে এই অভাব যথেষ্টভাবে পূর্ণ হতে থাকবে এই আশা ক'রে রইলুম।[৭]

আবুল ফজলের 'প্রদীপ ও পতঙ্গ' উপন্যাস নাগরিক মধ্যবিত্তের হার্দিক রক্তক্ষরণের শিল্প-প্রতিমা; আর 'সাহসিকা' হচ্ছে বিকাশমান মুসলিম মধ্যবিত্তের স্বপ্নিল জীবনের বিশ্বস্ত শব্দরূপ। নাগরিকচেতনার প্রথম অঙ্গীকারে, চেতনাপ্রবাহরীতির সীমিত বিন্যাসে, বিষয়-নির্বাচনের বৈচিত্র্যে, সমাজ-অচলায়তনে বন্দী নারী-ব্যক্তিত্বের উন্মোচনে এবং প্রকরণ-পরিচর্যার পরীক্ষা-প্রবণতায় আবুল ফজলের এই ত্রয়ী-উপন্যাস উন্মেষ-পর্বের পূর্ব-বাংলার কথাসাহিত্যে সংযোজন করেছে স্বতন্ত্র এবং সুদূরসঞ্চারী মাত্রা।

'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সৈনিক আবুল ফজলের উপন্যাসে উদার মানবতাবাদী-চেতনা, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিশীলিত মননের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর শিল্পীদের রচনার শিল্প-সার্থকতা আবুল ফজলের সৃষ্টিতে অনুসন্ধান অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অযৌক্তিক। 'কল্লোলে'র চেতনা আবুল ফজল মেধা দিয়ে অনুভব করেছেন মাত্র,

প্রাত্যহিক জীবন-অভিজ্ঞতায় তা সমৃদ্ধ নয় মোটেই। কারণ পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্তশ্রেণীর তখনো শৈশব-কাল। তাই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্তশ্রেণীর শতবর্ষের অন্ত-অসঙ্গতি, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা এবং বিপন্ন মূল্যবোধের শব্দরূপ তাঁর রচনায় প্রত্যাশিত নয়।[৮] এ-প্রসঙ্গে 'প্রদীপ ও পতঙ্গ' উপন্যাসের 'লেখকের কথা' শীর্ষক শেষ অধ্যায় থেকে একটি এলাকা উদ্ধৃত করা এখানে অনিবার্য :

> ···আধুনিক মানুষকে নিয়া গল্প লিখিতে বসাই এক ঝক্‌মারি ব্যাপার। জানাইবার মতো, লিখিবার মতো কী সংবাদই বা ইহাদের আছে ? আজ সকলের মনের দুর্গ মনেই ত ধসিয়া পড়িতেছে। কোন ভয়াবহ বিস্ফোরণ আজ কোথায় ? কাজেই, বলাবাহুল্য, কিছু একটা অঘটন ঘটিবার সমস্ত আশা রশিদ নিজ গুণেই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। এই গল্পের অকালমৃত্যু সে-ই ডাকিয়া আনিয়াছে। লেখকের বিন্দু-বিসর্গ দায়িত্ব ইহাতে নাই।[৯]

প্রাক্-সাতচল্লিশ পর্বে গ্রামীণ সংগ্রামশীল মানুষ এবং নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্তের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে ধারণ করেই পূর্ববাংলার উপন্যাসের অভিযাত্রা। এ-পর্বের উপন্যাসসমূহে প্রাধান্য পেয়েছে সামন্ত-মূল্যবোধসমূহ, তবু মানবতাবাদী চেতনার শিল্পরূপ অঙ্কনের প্রয়াস এ-পর্বে, সীমিত হলেও, একেবারে উপেক্ষিত নয়। বিভাগ-পূর্ব কালের উপন্যাস প্রধানত গ্রাম-জীবনকেন্দ্রিক ; তবে কখনো কখনো সেখানে এসেছে বিকাশমান নগর-জীবনের খণ্ডিত ছবি। প্রাক্-সাতচল্লিশ পর্বের এই উত্তরাধিকারের ওপরেই নির্মিত হয়েছে বিভাগোত্তর কালের উপন্যাসসাহিত্য।

দুই

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের ষড়যন্ত্রে ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'পাকিস্তান' নামক কৃত্রিম রাষ্ট্রের শৃঙ্খলে পূর্ববঙ্গের উঠতি মধ্যবিত্তশ্রেণীর অগ্রযাত্রা হলো বাধাপ্রাপ্ত। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ববাংলার উঠতি পুঁজিবাদী-গোষ্ঠী এবং নবজাগ্রত মধ্যবিত্তশ্রেণী অনুভব করলো তাদের অস্তিত্বের অন্তর্সঙ্কট। পাকিস্তানি বৃহৎ পুঁজির আর্থিক স্বার্থেই পূর্ববাংলা রূপান্তরিত

হল আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী একটা অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে। ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে সমাজ-বিকাশের এই প্রতিবন্ধকতা শিল্পীর চৈতন্যকে অনিবার্যভাবেই প্রভাবিত করলো। ফলতঃ বুর্জোয়া মানবতাবাদে প্রত্যয়ী শিল্পীর মানসলোকে উপ্ত হলো সংকটের বীজ।

আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মাতৃ-ভাষাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলায় প্রগতিশীল নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রথম প্রতিবাদ উচ্চারিত হলো ১৯৪৮ সালে। ১৯৫২ সালে সংঘটিত হলো, অনেকটা অসংগঠিত এবং আকস্মিক ভাবে, ইতিহাস-সৃষ্টিকারী ভাষা-আন্দোলন। আমাদের রাজনীতি এবং সমাজ-সংস্কৃতির অন্তর্ভুবনে ভাষা-আন্দোলন সঞ্চার করলো স্বাধিকার-প্রত্যাশী চৈতন্য। বায়ান্নর রক্তিম প্রতিবাদ পূর্ববাংলার জনমনে যেমন তোলে ঊর্মিল আলোড়ন; তেমনি সামন্ত-মূল্যবোধসিক্ত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সুদৃঢ় পলল ভিতও হয়ে ওঠে শিথিল। মানবতাবাদী গণতান্ত্রিক এবং মার্ক্সীয় চেতনাপুষ্ট শক্তিসমূহ পূর্ববাংলার সমাজজীবনের প্রায় সকল স্তরে অতিদ্রুত প্রভাব বিস্তার করতে থাকে—যার ফলে ১৯৫৪-র সাধারণ নির্বাচনে বেণিয়াপুঁজি ও সামন্তশক্তির ধারক মুসলিম লীগ, সকল প্রয়াস সত্ত্বেও, পরাজিত হয়; এবং প্রগতিশীল শক্তি যুক্তফ্রন্ট অর্জন করে বিপুল বিজয়। অতঃপর ১৯৫৮-র অগস্ট পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ বার বার মন্ত্রীসভার পতন সুগম করে দেয় পাকিস্তানি সামরিক-জান্তার ক্ষমতা-দখলের পথ।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক-শাসন প্রবর্তন-পূর্ব কাল-পরিসর এ-দেশের সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি বিশেষ পর্যায়। তাই আলোচ্য সময়-সীমায় রচিত উপন্যাসসমূহ আমরা বাংলাদেশের উপন্যাসের প্রথম পর্ব হিসেবে বিবেচনা করেছি। সময়ের এই পর্ব-বিভাজন মোটেই স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত নয়; সাতচল্লিশোত্তর পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে এ-বিভাজন অবশ্যই সমাজসত্য-সম্মত।

বিভাগোত্তর কালে প্রথম দশকে উপন্যাস রচনায় যাঁরা ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আবুল ফজল, আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), আবু

ইসহাক (১৯২৬-), আকবর হোসেন (১৯১৭-১৯৮১), কাজী আফসার-উদ্দীন (১৯২১-), আবু রুশদ (১৯১৯-), ইসহাক চাখারী (১৯২২-), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১), সরদার জয়েনউদ্দীন (১৯২৩-), শওকত ওসমান (১৯১৭-), দৌলতুন্নেছা খাতুন (১৯২২-), শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-), আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (১৯৩১-) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭, সময়ের এ-পর্বে প্রকাশিত উপন্যাসসমূহ প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক ঘটনাংশ আশ্রয় করে নির্মিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের প্রশাসনিক কার্যক্রমের কেন্দ্র হলেও ঢাকা শহরের প্রকৃত নগরায়ণ বিলম্বিত হয়েছে ঐতিহাসিক কারণেই। ফলতঃ আমাদের শিল্প-সাহিত্যেও নাগরিকচেতনার অনুপ্রবেশ হয় বিলম্বিত। তবু, সীমিত অর্থে হলেও, প্রথম পর্বের ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আবুল ফজল এবং আবু রুশদের শিল্পকর্মে নগরচেতনার প্রতিভাস দুর্লক্ষ্য নয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে বাদ দিলে, এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, প্রথম পর্বের ঔপন্যাসিকরা আঙ্গিক-নির্মিতি, ভাষা-ব্যবহার এবং প্রকরণ-প্রসাধনে একান্তই অসতর্ক, অমনোযোগী এবং অমিতাচারী।

আলোচ্য পর্বে প্রকাশিত হয় আবুল ফজলের দু'টি উপন্যাস—'জীবন পথের যাত্রী' (১৯৪৮) এবং 'রাঙ্গা প্রভাত' (১৯৫৭)। 'জীবন পথের যাত্রী' ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের শিল্পরূপ। এ-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা 'কল্লোলী'য় নাগরিক-চেতনার বৃত্তে অনুসন্ধান করেছে জীবনের সুস্থ মূল্যবোধ। তবে ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন-পর্যবেক্ষণ অন্তে শুভ্রতা আর সুস্থতার জন্যে আবুল ফজলের আকাঙ্ক্ষা এবং সে-আকাঙ্ক্ষার শিল্পমূর্তি-সৃজনে এ-উপন্যাসে ঘটেনি প্রসঙ্গ ও প্রকরণের পার্বতী-পরমেশ্বর মিলন। গ্রাম ও নগরজীবনের পটভূমিকায় বিস্তৃত 'রাঙ্গা প্রভাত' উপন্যাসে প্রতিভাত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক জীবনদর্শনের প্রতি আবুল ফজলের আন্তরিক বিশ্বাস। আদর্শবাদী চারুবাবুর ভাবশিষ্য কামালের সঙ্গে তাঁর কন্যা মায়ার প্রেমের রোম্যান্টিক-মেলোড্রামাটিক পটে, রাঙ্গা প্রভাতের প্রতীকে, লেখক এখানে শোষণহীন-সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত এক সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্নের ছবি এঁকেছেন। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৬০), তেমনি আবুল ফজলও যাত্রা শুরু করেছেন ফ্রয়েড থেকে, আর পরিণতিতে গ্রহণ করেছেন কার্ল মার্ক্সকে।

তবে মার্ক্সবাদী-চেতনা প্রকাশে 'রাঙা প্রভাত' উপন্যাসে আবুল ফজল শৈল্পিক-সংযম রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন ; ফলে এটি পরিণত হয়েছে একান্তই উদ্দেশ্যপ্রধান রচনায়। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের সিদ্ধান্ত এখানে স্মরণীয় :

> তিনি সচেতনভাবে উদ্দেশ্যপ্রধান শিল্পী। তাঁর রচনার নায়ক-নায়িকা প্রধানতঃ সমাজসেবী, দেশদরদী ; প্রচলিত অর্থে ধর্মান্ধ নয়, উদার মানবধর্মে বিশ্বাসী। এ-উপন্যাসেও পাকিস্তানের পটভূমিতে মুসলিম তরুণ ও হিন্দু তরুণীর মিলনের মধ্য দিয়ে তিনি রক্তক্ষয়ী হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কল্পনা করেছেন। তবে উদ্দেশ্যপ্রধান রচনার সাধারণ দুর্বলতা : বক্তৃতাময় সংলাপ, ভাবার্দ্রতা, একমুখী আদর্শ চরিত্র ইত্যাদি থেকে 'রাঙা প্রভাত' মুক্ত নয়।[১০]

গ্রামীণ-জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত শওকত ওসমানের 'জননী' (১৯৬১)[১১] উপন্যাসে শব্দবন্দী হয়েছে লেখকের উদার মানবতাবাদী জীবনজিজ্ঞাসা। পশ্চিমবাংলার গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে মহেশডাঙা নামক গ্রামের কোন-এক দরিয়া বিবির রূপকে এখানে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে সমাজ-শৃঙ্খলে বন্দী গ্রামীণ নারীর নীরব সহনশীলতা এবং আত্মত্যাগের ইতিকথা। 'জননী' মনীষাদীপ্ত উপন্যাস নয়, বরং আবেগধর্মী। প্রতিকূল সমাজ-প্রতিবেশের বিরুদ্ধে তীব্র জীবনসংগ্রামের প্রেক্ষাপটে এ-উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে চিরায়ত বাঙালি-মাতৃস্নেহ। সমাজ-সত্য আছে, আছে গ্রামীণ জোতদারের লিবিডো-তাড়িত বিকৃত বাসনার চিত্র—তবু 'জননীর' মুখ্য উপজীব্য মাতৃত্বের গৌরব-গাথা। যেমন সমাজসত্য-উপস্থাপনে ও চরিত্রচিত্রণ-নৈপুণ্যে, তেমনি প্রকরণ-পরিচর্যায় শওকত ওসমানের 'জননী' পূর্ববাংলার কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল শিল্পকর্ম।

ঘটনাংশ এবং প্রকরণের শৈল্পিক সমন্বয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু' (১৯৪৮) বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের একটি দীপ্তিমান এবং অনতিক্রান্ত শিল্প-প্রতিমা। এ-উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে ধর্ম-ব্যবসায়ী মজিদের অস্তিত্বের অন্তর্সংকট। বহির্মুখী জীবন নয়, বরং মজিদের আভ্যন্তর সংকট-সংশয় এবং নৈঃসঙ্গ্য এ-উপন্যাসের মৌল-প্রতিপাদ্য। মজিদ-চরিত্রের

মাধ্যমে লেখক এখানে চিত্রিত করেছেন পূর্ববাংলায় ধর্ম-ব্যবসায়ীদের শোষণ ও ভণ্ডামীর চিত্র। ওয়ালীউল্লাহ্‌র পরবর্তী রচনা 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) কিংবা 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮) উপন্যাসে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে যে-অস্তিত্বের অভীপ্সা, তার পূর্বাভাস 'লালসালু'তেই লক্ষণীয়। লালসালুতে আচ্ছাদিত 'মাছের পিঠের মতো মাজারের' দিকে জমিলার পদাঘাত—সঙ্কেত অস্তিত্বের শুদ্ধ-সত্তায় উত্তরণেরই প্রতীক-চিত্র। আত্মস্থ রচনাশৈলী, পরিস্রুত ভাষা, পরিমার্জিত গীতময়তা এবং প্রতীক-উপমা-উৎপ্রেক্ষার সমন্বয়ে 'লালসালু' হয়ে-উঠেছে একটি স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম। 'লালসালু' উপন্যাসে লেখকের প্রকরণ-সতর্কতা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'লালসালু'তে ওয়ালীউল্লাহ্‌ প্রধানত ব্যবহার করেছেন ইমপ্রেশনিস্ট এবং প্রতীকী-পরিচর্যা। যেমন, প্রকৃতির অনুষঙ্গে, তাহেরের বাপের নিরস্তিত্ব হওয়ার প্রতীকী-পরিচর্যা :

> দুদিন পরে ঝড় ওঠে। আকাশে দুরন্ত হাওয়া, আর দলে-ভারী কালো কালো মেঘে লড়াই ; মহব্বত নগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দী পাখির মত আছড়াতে থাকে। হাওয়া মাঠে ঘূর্ণিপাক খেয়ে আসে, তির্যক ভঙ্গিতে বাজপাখির মত শো করে নেমে আসে, কখনো ভোঁতা প্রশস্ততায় হাতীর মত ঠেলে এগিয়ে যায়। [১২]

আবু ইসহাকের স্কেচধর্মী রচনা 'সূর্যদীঘল বাড়ী'তেও (১৯৫৫) চিত্রিত হয়েছে গ্রামীণ-জীবনের কুসংস্কার, মহাজনী শোষণ, জোতদারের বিকৃত-লালসা, দরিদ্র মানুষ জয়গুন-হাসুদের জীবন-সংগ্রামের ছবি। জয়গুনদের গ্রাম ছেড়ে শহরে নির্বাসন আসলে গ্রাম-বাংলার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সংকেত। বিষয়-গৌরবে ব্যতিক্রমী হলেও, লেখকের অমীমাংসিত জীবনদৃষ্টি, সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং সমাজ-প্রগতির ধারা অনুসন্ধানে মধ্যবিত্তসুলভ ভ্রান্তি ক্ষুণ্ন করেছে 'সূর্যদীঘল বাড়ী'র শিল্পমূল্য। তবু এ-কথা স্বীকার করতেই হয়, আবু ইসহাকের 'সূর্যদীঘল বাড়ী' ধর্মজীবীর শোষণে নিষ্পেষিত, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে উন্মূলিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম-জীবনের সমগ্র-তাস্পর্শী অসংখ্য জয়গুন-হাসুদের জীবন-যাপনের বিশ্বস্ত রূপবন্ধ।

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান'-এ (১৯৫২ সালে সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত ; গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৬০) মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণে

জীবন-বীক্ষণের প্রতিশ্রুতি আছে ; তবে সে-প্রতিশ্রুতি অতি-রোম্যান্টিকতার মোহাবেশে সহসাই দ্বিধান্বিত। লেখকের সমাজবোধ ও ইতিহাসচেতনা বুর্জোয়া রোম্যান্টিকতার চোরাবালিতে হারিয়ে গেছে—ফলতঃ প্রথমিক-প্রতিশ্রুতি বিচ্যুৎ হয়ে উপন্যাসটি মহৎ-সৃষ্টির সম্ভাবনাকে অঙ্কুরোদ্‌গমের পরেই বিনষ্ট করেছে। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর ভাষাবোধ এবং পরিচর্যা-সচেতনা তাঁর প্রাতিস্বিক শিল্প-চৈতন্যেরই স্বাক্ষরবহ।

গ্রামীণ মানুষের জীবন-যাপনের একদিন-প্রতিদিনের শব্দরূপ কাজী আফসারউদ্দীনের 'চর ভাঙ্গা চর' (১৯৫১)। এটিই পূর্ববাংলার প্রথম উপন্যাস, যেখানে ঔপন্যাসিক, সীমিত হলেও, সচেতনভাবে প্রকৃতিকে উপস্থাপন করেছেন প্রতীকী ব্যঞ্জনায়। মানুষ নয়, বরং প্রকৃতিই 'চর ভাঙ্গা চর'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র। বর্গীর আক্রমণ থেকে পাঠান এবং মোঘল আমলে ধলেশ্বরী-চরের সংগ্রামশীল মানুষের জীবন-চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে। কাজী আফসারউদ্দীনের 'কলাবতী কন্যা' (১৯৫৬) এবং 'নোনা পানির ঢেউ' (১৯৫৮) এ-পর্বের দু'টো জনপ্রিয় উপন্যাস। দৌলতুন্নেছার 'পথের পরশ' (১৯৫৭) ; ইসহাক চাখারীর 'পরাজয়' (১৯৫৪), 'মেঘবরণ কেশ' (১৯৫৫) প্রভৃতি উপন্যাস কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্ম-ভীতু, স্থবির এবং অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত গ্রাম-জীবনের বিশ্বস্ত রূপচিত্র। তবে নন্দনতত্ত্বের বিচারে, শিল্প হিসেবে এ-গুলোর মূল্য যে অকিঞ্চিৎকর, একথা বলাইবাহুল্য। ঘটনাভুক পাঠকের সুখদ মনোরঞ্জনের কারণে আকবর হোসেনের 'অবাঞ্ছিত' (১৯৫০), 'কি পাইনি' (১৯৫১), 'মোহমুক্তি' (১৯৫২) প্রভৃতি উপন্যাস এ-পর্বে লাভ করে সহজ জনপ্রিতা ; শিল্পবোধ এবং সমাজচেতনার অভাবে, সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, আকবর হোসেন কোন উপন্যাসেই সচেতন পাঠকের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারেননি।

আবু রুশ্‌দ 'সামনে নতুন দিন' (১৯৫৬) উপন্যাসে মধ্যবিত্তের জীবন-যন্ত্রণা নগরজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন ; তবে শিল্প-সচেতনতার অভাবে তাঁর এ-প্রয়াস শিল্পিত হয়ে ওঠেনি। মধ্যবিত্তের জীবনসঙ্কট নয়, বোধ করি, নগরজীবনের উপরিতলের চিত্র অঙ্কনেই তিনি অধিক উৎসাহী। কেন্দ্রানুগ শক্তির অভাবে জনৈক রহমান সাহেবের জীবনের ঘটনাগুলো একসূত্রে মিলিত হতে পারেনি এবং এখানেই

এ-উপন্যাসের আঙ্গিকগত সঙ্কট। তবু আবু রুশ্‌দের 'সামনে নতুন দিন' উপন্যাস এ-অর্থেই তাৎপর্যপূর্ণ যে, ষাটের দশকে আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যে নাগরিক-চেতনার যে প্রতিভাস, তার প্রাথমিক প্রকাশ এখানে দুর্লক্ষ্য নয়।

সরদার জয়েনউদ্দীনের' আদিগন্ত' (১৯৫৬) গ্রামবাংলার নিম্নবিত্ত মানুষের প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রামের ভাষাচিত্র। সমাজসচেতন-আশাবাদ ধ্বনিত হলেও, ভাষা-ব্যবহার ও পরিচর্যার শৈথিল্যে এবং মননশীলতার অভাবে শিল্প-বিচারে 'আদিগন্ত' দুর্বল সৃষ্টি। শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'কাশবনের কন্যা' (১৯৫৪) নির্মিত হয়েছে দক্ষিণবাংলার মাঝিদের জীবনকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের চরিত্রগুলো লেখকের মধ্যবিত্তসুলভ রোম্যান্টিক-তার চোরাগলিতে আত্মসমর্পণ করেছে; সংগ্রামশীল হওয়া সত্ত্বেও অন্তর-ধর্মে তারা দ্বিধাগ্রস্ত, ভাবাবেগপূর্ণ এবং উচ্ছ্বাসপ্রবণ। তবু এ-উপন্যাসের কবিতাস্পর্শী শব্দস্রোতে প্রতিদিনের নদীময় দক্ষিণবাংলা কল্লোলিত যেন। এ-পর্বেই প্রকাশিত হয় তাঁর আরো তিনটি উপন্যাস—'আশিয়ানা' (১৯৫৫), 'আলম নগরের উপকথা' (১৯৫৫) এবং 'জীবনকাব্য' (১৯৫৬)। যুগ-পরম্পরায় প্রসারিত 'আলম নগরের উপকথা'[১৩] উপন্যাসে উপকথা এবং ইতিহাসের ঘটেছে পরস্পর অন্তর্বয়ন-মিলন। এ-উপন্যাস লেখকের ইতিহাস-জ্ঞান, সময় ও সমাজ-অভিজ্ঞতার স্বাক্ষরবাহী। অবক্ষয়িত সামন্ত-পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং প্রাচীন সমাজকাঠামো-ভাঙনের রূপচিত্রের মধ্য দিয়ে এখানে উৎসারিত হয়েছে নতুন সমাজ-নির্মাণের অভিলাষ।

গ্রাম ও নগরজীবনের পটভূমিতে বিধৃত এবং শিল্পচেতনা ও সমাজ-বোধের সমন্বয়ে রচিত আবুল মনসুর আহমদের 'জীবন ক্ষুধা' (১৯৫৫) এ-পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক হালিম নব-জাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্তের সচেতন প্রতিনিধি। এ-উপন্যাসের বিস্তৃত পটে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের ভারত-ছাড় আন্দোলন, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ঘটনা। জীবনার্থ, ভাষা-ব্যবহার এবং ঘটনা-বিন্যাসের বিচারে 'জীবন ক্ষুধা' আবুল মনসুর আহমদের একটি নিরীক্ষাধর্মী শিল্পকর্ম।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭, সময়ের এ-পর্বে প্রকাশিত অধিকাংশ উপন্যাসেই উৎসারিত হয়েছে ঔপন্যাসিকদের বুর্জোয়া মানবতাবাদী জীবন-ভাবনা।

আলোচ্য কালসীমায় রচিত প্রায় সব উপন্যাসেই উদ্ভাসিত হয়েছে পূর্ববাংলার গ্রামীণ-জীবন। এ-পর্বের ঔপন্যাসিকরা ঘটনা-নির্বাচনে প্রধানত গ্রামমুখীন। তবে আবুল ফজল, আবু রুশদ্, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখের রচনায় নাগরিকচেতনার সীমিত প্রকাশ এ-পর্বেই লক্ষণীয়। ব্যক্তির সামাজিক জীবনের সঙ্গে তার অন্তর্জীবনের বহুমাত্রিক জটিলতার উন্মোচন-প্রয়াসও এ-পর্বের উপন্যাসের অন্যতম স্বভাবলক্ষণ। প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, এ-সময়ের অধিকাংশ উপন্যাসই মহৎ-সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি, কেবলমাত্র লেখকদের সংশয়ী এবং দ্বিধান্বিত সমাজবোধের জন্য। প্রাক্-সাতচল্লিশ সময়ের ঔপন্যাসিক মূল্যবোধের সঙ্গে এ-পর্বে যুক্ত হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র একাকিত্ববোধ এবং অন্তরমুখিতা, আবুল ফজলের নাগরিকচেতনা, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর সমাজবাদী জীবন ভাবনা এবং শামসুদ্দীন আবুল কালামের নঞর্থক রোম্যান্টিকতা। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, বায়ান্নর রক্তিম উজ্জীবনের ফলেই এ-পর্বের উপন্যাসসমূহ জীবন-কেন্দ্রিক, সত্য-অন্বেষী এবং মৃত্তিকামূলসংলগ্ন।

তিন

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন পূর্ববাংলার শিল্পীদের মনে-মননে-স্নায়ুতে যে প্রগতিশীল চেতনার জন্ম দিয়েছিল, ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবরে প্রবর্তিত আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে তা সাময়িকভাবে হয়ে গেল স্তব্ধ। পূর্ববাংলায় নেমে এলো সামরিক শাসনের বর্বর অত্যাচার। নবজাগ্রত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সামনে তখন অবরুদ্ধ-সময়ের দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল, ধাতব অস্ত্র-ধারীর নিষ্ঠুর নিপীড়ন। বন্দী-সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের শিল্পীরা শৃংখল-মোচনের পথ-নির্দেশ নয়, বরং হন্যে হয়ে খুঁজলেন এক চিলতে নিরাপদ আশ্রয়। স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী পূর্ববাংলার প্রগতিশীল যে-সব শিল্পী সময়ের প্রথম পর্বে সত্যসন্ধানী এবং জীবনকেন্দ্রিক ; ১৯৫৮ সালের পর তাঁরাই হলেন জীবন-পলাতক, ক্রমবিকাশে শংকিত এবং আত্মরোমন্থনে পরিতৃপ্ত। মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষের মতোই এঁরা তখন বেতার, টেলিভিশিন, বি. এন. আর., লেখক সংঘ এবং প্রেস-ট্রাস্টের আচ্ছাদনে পরিণত হলেন ঔপনিবেশিক শাসকের বেতনভুক সেবাদাসে। কেউবা আবার

সমাজবাদী জীবনভাবনাকে সরাসরি প্রকাশ করতে ভীত হলেন, আশ্রয় নিলেন রূপক-প্রতীক ও রূপকথা-পুরাণের জগতে। কতিপয় ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্টলোকে হাতছানি দিল ফ্রয়েড—ফলে আমাদের ঔপন্যাসিক-চৈতন্যে এলো লিবিডো-তাড়িত, রিরংসাপ্রিয়, পলায়নবাদী এবং বিবরসন্ধানী নঞর্থক জীবনভাবনা। এবং এ-ভাবেই যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় বুর্জোয়া সমাজের পচনশীলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলো পূর্ববাংলার বেশ কিছু ঔপন্যাসিক। সমকালীন ঔপন্যাসিক-চৈতন্যের এই সংকট-সংশয় ও পরাভব কিভাবে আমাদের কথাসাহিত্যকে গ্রাস করেছিল, সমালোচকের লেখায় তার রূপ ধরা পড়েছে :

> আমরা যেন এক রুদ্ধ ঘরে বাস করছি। সব দরজা জানলা বন্ধ, বাইরে আকাশ তাম্রাভ, হাওয়া নেই এবং পাখিগুলির কণ্ঠ স্তব্ধ। আমাদের ঘরে গুমোট হাওয়া বহুব্যবহৃত। আমরা শান্ত, নিঃসংগ, বিফল আত্মকণ্ডুয়নে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছি, একটা বিশ্রী ঘানির সংগে যুক্ত অবস্থায় অর্থহীন পরিক্রমণে আমরা আমাদের সময়কে ক্রমাগত পুড়িয়ে নিঃশেষ করছি।[১৪]

বিপর্যস্ত যুগ-পরিবেশে বাস করেও সমকাল-চঞ্চল জীবনাবেগ, যুগ-সংক্ষোভ এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-দ্রোহ-বিদ্রোহ অঙ্গীকার করে মহৎ শিল্পী-চৈতন্য অনুসন্ধান করে জীবন ও শিল্পের জন্য সদর্থক এবং আলোকোজ্জ্বল এক মানস-ভূমি। সামরিক-শাসনের ভয়ে আমাদের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক সমাজ-সংক্ষোভ আর জীবন-সত্য ভুলে গেলেও, ব্যতিক্রম যে দু'একজন ছিলেন না, এমন নয়। স্বৈর-শাসনের শৃংখলে বাস করেও কোন কোন ঔপন্যাসিক ছিলেন সত্য-সন্ধানী, সংরক্ত সমকালস্পর্শী এবং প্রগতিশীল সমাজভাবনায় উচ্চকিত।

১৯৫৮ সাল থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্ব-পর্যন্ত সময়-সীমায় আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে ধরা পড়েছে উপর্যুক্ত দুটি প্রধান চেতনা-স্রোত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর, সব কিছুর মতোই, আমাদের সাহিত্যেও এলো পরিবর্তন। তাই ১৯৫৮ থেকে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ে প্রকাশিত উপন্যাসসমূহকে আমরা বিবেচনা করব দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস হিসেবে।

জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার প্রশ্নে 'জননী'র স্রষ্টা শওকত ওসমান এ-পর্বে সংরক্ত-সমকাল এবং সমাজ-বাস্তবতা এড়িয়ে গেলেন ; আশ্রয় নিলেন রূপক-প্রতীক ও রূপকথার জগতে। আলোচ্য সময়ে প্রকাশিত হয় তাঁর চারটি উপন্যাস —'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২), 'সমাগম' (১৯৬৭), 'চৌরসন্ধি' (১৯৬৮) এবং 'রাজা উপাখ্যান' (১৯৭০)। 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসে আইয়ুব-শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার শোষিত মানুষের প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে প্রতীকী-ব্যঞ্জনায়। 'প্রতিধ্বনির সাহায্যে গিরি-কন্দরের গভীরতা এবং দূরত্ব-জ্ঞাপনের পন্থায় রচিত' 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসে শওকত ওসমান স্বকাল-সমকাল থেকে যদিও পলাতক, তবু বিষয়-ভাবনা এবং আঙ্গিক-স্বাতন্ত্র্যের জন্য অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। 'দীরহাম দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস গোলাম কেনা চলে, বান্দী কেনা সম্ভব—ক্রীতদাসের হাসি কেনা যায় না'—নায়কের এ-উক্তি সর্বকাল, সর্বদেশের জন্যই সমান সত্য। তাঁর 'রাজা উপাখ্যান'ও প্রতীকাশ্রয়ী রচনা। সাহসী হরমুজ কর্তৃক দু'টো গোখরো সাপ দ্বারা শৃংখলিত সম্রাট জাহুক ও অন্যান্যদের মুক্তিলাভের রূপকচিত্রে এখানে উদ্ভাসিত হয়েছে ব্যক্তি-স্বাধীনতা-আকাঙ্খী ও মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম ও বিজয়ের ইতিকথা। ষাটের দশকে সামরিক-শাসনের শৃঙ্খল মোচনের জন্য মুক্তিকামী বাঙালির সংগ্রাম-সংকল্প ও প্রত্যয়-প্রত্যাশা এ-উপন্যাসে শিল্পিত ভাষ্যে রূপায়িত হয়েছে।

শওকত ওসমান 'সমাগম' উপন্যাসে বিচরণ করেছেন রূপকথার রাজ্যে। 'মানুষের বিশ্বভ্রাতৃত্ব অক্ষয় হোক। ধ্বংস হোক, সাম্রাজ্যবাদীগণ ও তাদের অনুচরেরা ধ্বংস হোক।··· মানুষের নির্বোধতম সংগঠন হিসেবে ধ্বংস হোক যুদ্ধ।··· সুখীতর, আরো সমৃদ্ধিতর হোক আগামী দিনের পৃথিবী।'[১৫] এই-ই হচ্ছে 'সমাগম' উপন্যাসে শওকত ওসমানের মৌল-অভিজ্ঞান। নগরজীবনের পটে বিন্যস্ত 'চৌরসন্ধি' উপন্যাসে শওকত ওসমান পুঁজিপতি সমাজের হীন ষড়যন্ত্র এবং শোষণের চিত্র তুলে ধরেছেন। শওকত ওসমানের এ-সব উপন্যাসে রূপকের মধ্য দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে অবরুদ্ধ জাতিসত্তার স্বাধিকার-স্পৃহা। আঙ্গিকগত অভিনবত্বে এবং বিষয়ের বৈচিত্র্যে শওকত ওসমানের উপন্যাসসমূহ বাংলাদেশের উপন্যাসসাহিত্যের তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পকর্ম।

দ্বিতীয় পর্বে প্রকাশিত হয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দু'টো উপন্যাস—'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮)। 'লালসালু' উপন্যাসে মজিদ-কল্পিত মোদাচ্ছের পীরের মাজারে জমিলার পদাঘাত-সঙ্কেতে অস্তিত্বের যে অভীপ্সা প্রতীকায়িত—এ-দু'টো উপন্যাসে সেই অস্তিত্বচেতনা হয়েছে আরো বলয়িত এবং সুস্পষ্ট। ভয়-ভীতি অতিক্রম করে 'চাঁদের অমাবস্যা'র আরেফ আলী এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো'র খতিব মিঞা উত্তীর্ণ হয়েছে পরম নির্ভীক সত্তার শুদ্ধ জাগরচৈতন্যে। 'চাঁদের অমাবস্যা' এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ মানবমুখীন এবং কল্যাণময় অস্তিত্ববাদী দর্শনে হয়েছেন স্থিতধী। আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বিশেষত্ব হলো—তিনি বিষয়াংশ-নির্বাচনে এবং আঙ্গিক-নির্মিতিতে সতত নিরীক্ষাপ্রিয় ও পরীক্ষাপ্রবণ। তাঁর শিল্পী-চৈতন্য ক্রম-অগ্রসরমান; স্বাতিক্রমণই তাঁর জীবনার্থের মূলকথা। চরিত্রের আভ্যন্তর সংকট ও সংক্ষোভ উপস্থাপনে ওয়ালীউল্লাহ্‌ তাঁর উপন্যাসে কখনো ব্যবহার করেছেন ইমপ্রেশনিস্ট পরিচর্যা, কখনো এক্সপ্রেশনিস্ট; আবার কখনো বা পরাবাস্তববাদী পরিচর্যা। যেমন 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে বিকৃত-বিপর্যস্ত মুহাম্মদ মুস্তাফার অস্তিত্বহীনতা উপস্থাপনে পরাবাস্তববাদী পরিচর্যা :

> সুটকেসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, এমন সময় সেটি অকস্মাৎ কাঁপতে শুরু করে : সুটকেসটি যেন একটি শুষ্করক্ত গাঢ় রঙের কলিজায় পরিণত হয়েছে। সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। হয়তো এবার দরজার নিকটে স্থাপিত লণ্ঠনের দিকে তাকায়। তবে কলিজাটা তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেখানেও হাজির হয় এবং আকারে সহসা ছোট হয়ে লণ্ঠনের গায়ে পতঙ্গের মত ডানা ঝাপ্‌টাতে শুরু করে। মুহাম্মদ মুস্তাফা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এই আশায় যে, পতঙ্গটি পুড়ে মারা যাবে,তার চঞ্চল ক্ষুধার্ত ডানা স্তব্ধ হবে, কিন্তু পতঙ্গটি স্তব্ধ হয় না। এবার মেঝের দিকে তাকালে সেখানেও কলিজাটি দেখতে পায়; মেঝের ওপর সেটি ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত ধড়ফড় করছে যেন।[১৬]

"সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস আমাদের নিয়ে যায় অস্তিত্বের প্রগাঢ় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, বিমিশ্র সত্তা থেকে শুদ্ধসত্তার অভিমুখে।"[১৭]

দৃষ্টিকোণ-নির্বাচনে, ভাষা-প্রয়োগে, প্রতীক-চিত্রকল্প-উপমা-উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টিতে এবং জীবনার্থের প্রাতিস্বিকতায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ত্রয়ী উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যে সূর্য-প্রত্যাশী স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষরবাহী।

পঞ্চাশের দশকে মার্কসবাদী চেতনায় আত্মস্থ আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীও এ-পর্বে অনুসন্ধান করলেন জীবনের সহজ নিরাপত্তা এবং সমর্পিত হলেন রোম্যান্টিক নীলিমাভ্রমণে। এ-পর্বে প্রকাশিত তিনটি উপন্যাসেই ['শেষ রজনীর চাঁদ' (১৯৬১), 'নাম না-জানা ভোর' (১৯৬২) এবং 'নীল যমুনা' (১৯৬৪)] তিনি হারিয়ে ফেললেন 'চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান-এর বস্তুনিষ্ঠা ; সংরক্ত সমকাল ভুলে গিয়ে আত্মমগ্ন হলেন রোম্যান্টিক স্বপ্নচারিতায়। তাঁর 'শেষ রজনীর চাঁদ' ঢাকা শহরে একই বাড়ির বাসিন্দা চারটি পরিবারকে কেন্দ্র করে রচিত একটি শাহরিক-জীবনের উপন্যাস। 'নাম না-জানা ভোর' উপন্যাস নিম্ন-মধ্যবিত্তের সন্তান ভাগ্যান্বেষী আলমের উচ্চবিত্তশ্রেণীতে উত্তরণের ইতিকথা। 'নীল যমুনা' উপন্যাসে গাফ্‌ফার চৌধুরী নীহাররঞ্জনীয় গোয়েন্দা গল্পের রহস্য-উন্মোচনে হয়ে পড়েছেন বিভ্রান্ত। তবে নগরচেতনার প্রকাশ এবং স্বতন্ত্র ভাষা ও আঙ্গিক-নির্মিতির জন্য গাফ্‌ফার চৌধুরীর এ-সব উপন্যাস আমাদের কথাসাহিত্যের অন্যতম শিল্পকর্ম।

'কাশবনের কন্যা' রচয়িতা শামসুদ্দীন আবুল কালামও আলোচ্য পর্বে জীবন-পলাতক। সংক্ষুব্ধ পঞ্চাশ-ষাটের দশক বিস্মৃত হয়ে 'কাঞ্চনমালা'য় (১৯৬১) তিনি বিচরণ করলেন বেদে জীবনভিত্তিক লোককাহিনীর ধূসর জগতে। "কাঞ্চনমালা'র কাহিনী নিরাবিল পুঁথির জগতে প্রসারিত।··· সমগ্র উপন্যাসের পটভূমি ও বক্তব্য পূর্বাপর পূর্ববাংলার বিখ্যাত লোকগীতিকা 'মহুয়া'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"[১৮] তবে লোককাহিনীকে আধুনিক জীবনচেতনার অঙ্গীকারে উপন্যাসের অবয়বে উপস্থাপনে শামসুদ্দীন আবুল কালাম যে সম্পূর্ণ সফল হননি, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

সরদার জয়েনউদ্দীনের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'অনেক সূর্যের আশা'র (১৯৬৭) বিস্তৃত ক্যানভাসে যুদ্ধ, মহামারী, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দুর্ভিক্ষ, আর্থিক বিপর্যয়, মানুষের নৈতিক অধঃপতন এবং জীবন-সংগ্রামের বহুমাত্রিক চিত্র অঙ্কিত

হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের পটভূমিকায় রচিত 'অনেক সূর্যের আশা'র কালসীমা ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ইতিহাস-আশ্রয়ী এই উপন্যাস ঔপনিবেশিক শাসনে অবরুদ্ধ আমাদের সমাজ-চৈতন্যকে প্রতিবাদে-বিদ্রোহে উদ্দীপ্ত করে তোলে। উত্তম পুরুষে বিবৃত এ-উপন্যাসের নায়ক রহমৎ অনেক সূর্যের আশার-আলোর উদ্ভাসক :

> তখন সুবেহ সাদিকের আলোয় আলোয় পূব আকাশ আলোর বন্যায় নেয়ে উঠেছে; ঝলমল করে রেঙে উঠছে দিগন্ত। মনে মনে কেবলই ভাবছি, ঐ ওখানে ঐ আলোর পারে সে-দেশ—সে স্বপ্নের দেশ—সে আজাদ দেশ আমার! যেখানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নাই, নাই অভুক্ত জনমানব। গরীব-কাঙাল-রাজা-জমিদার সব যেখানে সমান, সব একই মানুষ।[১৯]

ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের অন্ত-অসঙ্গতি এবং লুপ্তপ্রায় দাই-সম্প্রদায়ের জীবন-যন্ত্রণা নিয়ে গড়ে উঠেছে সরদার জয়েনউদ্দীনের 'পান্নামোতি' (১৯৬৫) উপন্যাস। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং কৃষক-সমাজের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ— বাংলার এই আয়ত ইতিহাস জয়েনউদ্দীনের 'নীল রঙ রক্ত' (১৯৬৫) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনাংশ। এই উপন্যাসে লেখকের ইতিহাসজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সংগ্রামীচেতনা। 'মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে একদিন জিতবেই'—পাবনার নীল-বিদ্রোহের নায়ক তোতামীরের (বা তিতুমীর) এই উক্তির মধ্য দিয়ে লেখক পরোক্ষে প্রকাশ করে দেন ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামশীল চৈতন্য।

১৯৫৮ সাল থেকে স্বাধীনতা-পূর্ব কালসীমায় রচিত আমাদের উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি যেমন বিচিত্রমুখী এবং বৈচিত্র্যসন্ধানী; তেমনি এ-পর্বে আবির্ভূত নতুন ঔপন্যাসিকদের সংখ্যাও আশাব্যঞ্জক। সময়ের এ-পর্বে যে-সব নতুন ঔপন্যাসিকের আগমন ঘটেছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সত্যেন সেন (১৯০৭—১৯৮১), শহীদুল্লা কায়সার (১৯২৬-১৯৭১), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-), রাজিয়া খান (১৯৩৬-), শওকত আলী (১৯৩৬-), জহীর রায়হান (১৯৩৩-১৯৭২),

মিজানুর রহমান শেলী, হুমায়ুন কাদির (১৯৩৫-১৯৭৭), আবদুর রাজ্জাক (১৯২৪—১৯৮১), রশীদ করিম (১৯২৫—), আহসান হাবীব (১৯১৭—), চৌধুরী শামসুর রহমান (১৯০২—), আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-), আনোয়ার পাশা (১৯২৮-১৯৭১), নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-), দিলারা হাশেম, আহমদ ছফা (১৯৪৩—), আবদার রশীদ (১৯৩০-) ইন্দু সাহা (১৯৪০—), খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (১৯২৪-), শহীদ আখন্দ (১৯৩৫—) প্রমুখ। এঁদের অধিকাংশের রচনায় উপস্থাপিত হলো মধ্যবিত্ত-জীবনের অতলগামী ক্ষয়িষ্ণুতা আর অতলান্ত শূন্যতা। ব্যক্তির বিনষ্টি-চিত্রণই এ-পর্বের অধিকাংশ ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট যেন। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, সংক্ষুব্ধ সমকাল এঁদের অনেকের রচনাতেই অভিব্যঞ্জিত হলোনা—বরং উদ্ভাসিত হলো তাঁদের আত্মরতিমূলক বিরংসাপ্রিয় পলায়নী মনোবৃত্তি। এ-পর্বের ঔপন্যাসিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য— রূপকল্প-নিরীক্ষা, ঘটনাংশ-নির্বাচন এবং ভাষা-নির্মিতিতে তাঁরা সতত পরীক্ষাপ্রবণ, বৈচিত্র্যঅন্বেষী, কিছুটা দুঃসাহসীও বটে।

ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন-রীতি প্রয়োগে এবং আত্মমগ্ন চেতনায় ব্যক্তিক-শূন্যতা চিত্রণে যাঁরা সমধিক আগ্রহী, তাঁরা হচ্ছেন রাজিয়া খান, আলাউদ্দিন আল-আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক এবং শওকত আলী। বিপন্ন এবং সংক্ষুব্ধ বর্তমানে দাঁড়িয়ে এঁরা খুঁজেছেন ব্যক্তি-মানুষের আন্তরিক বেদনাকে, পরম যন্ত্রণাকে। ব্যক্তির দায়িত্ব এঁদের রচনায় স্বীকৃত হলো না ;[২০] বরং সেই সর্বশূন্য বিবিক্ততা আর অতলান্ত নৈঃসঙ্গ্যের মাঝে এঁরা জীবনের অর্থ খোঁজার ব্যর্থ প্রয়াসে মেতে উঠলেন। সমষ্টি-অভিজ্ঞান থেকে এঁদের নায়ক-নায়িকা ক্রমশই একক ব্যক্তি-অভিজ্ঞানে অন্তর্লীন হতে চাইলো ; ফলে ষাটের দশকে এসে আমাদের উপন্যাসে এলো তিরিশের 'কল্লোলী'য় একাকিত্ববোধ আর নৈঃসঙ্গ্যচেতনা।

রাজিয়া খানের 'বটতলার উপন্যাস' (১৯৫৯) এবং 'অনুকল্প'-এর (১৯৫৯) মঈন-সুমিতা-হেটি-তরু-শামসা-মিণ্টু-রেণু-আশরাফ—সকলেই প্রেম আর শান্তির প্রত্যাশী ; কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, আধুনিক নাগরিক-চৈতন্যের যন্ত্রণা এবং মরভূ শূন্যতায় তারা নিঃশেষিত-প্রায়। নগরবাসী আধুনিক মানুষের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ, দুর্মর নিঃসঙ্গতা এবং অতলান্তিক শূন্যতা

উদ্ভাসিত হয়েছে রাজিয়া খানের উপন্যাসদ্বয়ে; এবং দুটি উপন্যাসেই শতাব্দীর যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নয়, বরং ক্লেদ-গ্লানি আর আত্মরতির পঙ্কে নির্দেশিত হয়েছে জীবনের পরিণতি। আধুনিক মানুষের যন্ত্রণা এবং ব্যক্তিক-মনস্তত্ত্ব উন্মোচনে রাজিয়া খানের ভাষা কবিতাস্পর্শী, আবেগসিক্ত এবং গীতিধ্বনিময়।

'জেগে আছি' (১৯৫০) কিংবা 'ধানকন্যা' (১৯৫১) গল্পগ্রন্থে আলাউদ্দিন আল-আজাদের মৃত্তিকা-সংলগ্ন জীবনচেতনা 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্র' (১৯৬০) 'কিংবা শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' (১৯৬২) উপন্যাসে শতাব্দীর অবক্ষয়ী মূল্যবোধের পঙ্কস্রোতে নিমজ্জিত-প্রায়। মধ্যবিত্ত নাগরিক-জীবনের চালচিত্র এই উপন্যাস দুটি সম্পর্কে হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩২-১৯৮৩) বিশ্লেষণ অনুভবসঞ্চারী :

> এ-দু'টো হলো তথাকথিত আধুনিক উপন্যাস—আমাদের উঠতি জীবন ধারায় যন্ত্রযুগের যে ক্ষয়িষ্ণুতার উপরিতলগত ও বহিঃপ্রভাবগত পরোক্ষ অনুপ্রবেশ ঘটেছে তারই প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করা হয়েছে এতে। কোনক্রমেই আমাদের জীবনের মূল সুর এখানে উপজীব্য নয়—বরং এক উদ্ভট যৌন-সর্বস্বতা সার্বজনীন উপকরণের উত্তরাধিকারে আধুনিক আঙ্গিক ও ভাবনার ঐতিহ্যে সাম্প্রতিকতার শামিল হতে চেয়েছে এ-ক্ষেত্রে যেন।[২১]

তবে জীবনের সুস্থতা আর কল্যাণের প্রতি আলাউদ্দিন আল-আজাদের আকর্ষণ দুর্নিবার। তাই বিকৃতি এবং অবক্ষয়ের মধ্যে বাস করেও 'তেইশ নম্বর তৈলচিত্রে'র নায়ক জাহেদ উপন্যাসের পরিণতিতে সুস্থ জীবনবোধে পরিস্নাত হতে সচেষ্ট হয়েছে। 'শীতের শেষ রাত বসন্তের প্রথম দিন' উপন্যাসে অপগত-যৌবনা বিলকিসের অবরুদ্ধ যৌনাকাঙ্ক্ষা বিকৃতির পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েও পরিণতিতে প্রত্যাবর্তন করেছে সুস্থ-স্নিগ্ধ জীবনার্থে; এবং এভাবেই শীতের কুয়াশা কাটিয়ে লেখক পৌঁছে যেতে চান প্রথম বসন্তের উজ্জ্বল ঊষায়।

আলাউদ্দিন আল-আজাদের এই বাসন্তি-যাত্রা সাফল্য অর্জন করেছে 'ক্ষুধা ও আশা' (১৯৬৫) উপন্যাসে এসে। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-মহামারী-যুগসংক্ষোভ-স্বাধীনতা সংগ্রাম—এই বিস্তৃত ক্যানভাসে রচিত 'ক্ষুধা ও আশা'

ইতিহাসচেতনা-সমৃদ্ধ এক মহাকাব্যিক উপন্যাস। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল-আজাদের শিল্পচেতনা মহত্তর জীবনার্থের সাধনায় প্রাগ্রসরমান। আলাউদ্দিন আল-আজাদ বিশ্বাস করেন: "উত্তরকালের মতো আজকের ঔপন্যাসিকও মুক্তিযোদ্ধা। এবং এই যুদ্ধের মানে শুধু সমাজ পরিবর্তন বা বিপ্লবের একনিষ্ঠ চারণ হওয়াই নয়, একটি উপন্যাসে একটি কুসংস্কারের মাথায় যে আঘাত হানল, সেও এই আয়োজনের সঙ্গে শরিক হল।"[২২] 'ক্ষুধা ও আশা' উপন্যাস এই বিশ্বাসেরই শিল্পিত স্বরগ্রাম। সমাজসত্য-আশ্রিত এবং মননশাসিত এই উপন্যাসে জীবনবোধের যে প্রকাশ লক্ষ্য করি, তাতে অবরুদ্ধ সমাজ-প্রতিবেশ এবং বিপর্যস্ত মূল্যবোধের মধ্যে বাস করেও আমরা উচ্চকিত হই সংগ্রামী মানবতার প্রতি। গ্রাম ও নগরের পটে বিস্তৃত খণ্ড খণ্ড জীবন-চিত্র এ-উপন্যাসে কেন্দ্রানুগ-শক্তির আকর্ষণে একই মোহনায় মিলিত হয়েছে। হানিফ-ফাতেমা-জোহা-জুহু—এ-সব নীচুতলার মানুষের জীবন-চিত্রণে ঔপন্যাসিক যতটা সার্থকতা অর্জন করেছেন, উপরতলার মুর্তজা-রেজা বা লীনার চরিত্র-চিত্রণে ততটা নন। বিষয়-নির্বাচনে ও প্রকরণ-পরিচর্যায় 'ক্ষুধা ও আশা' বাংলা সাহিত্যের একটি শিল্প-সফল উপন্যাস।

কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী-মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, এইসব প্রাত্যহিকতা নিয়ে গড়ে উঠেছে আলাউদ্দিন আল-আজাদের 'কর্ণফুলী' (১৯৬২) উপন্যাস। কাহিনীর মানবমুখীন পরিণতির মধ্য দিয়ে এখানেও অভিব্যঞ্জিত হয়েছে লেখকের আশাবাদী মানসিকতা। কল্লোলিত কর্ণফুলী, তার বুকে ভেসে-চলা মাঝি সম্প্রদায়, কর্ণফুলী-তীরবর্তী জনপদ, বিশেষ অঞ্চলের মাটি আর মানুষ, আঞ্চলিক ভাষা এবং আঞ্চলিক পরিবেশ—সবকিছু এ-উপন্যাসে একাত্ম হয়ে গেছে।

আধুনিক মনস্তত্ত্ব এবং লিবিডো-তাড়িত মনোবিকলনের সুখদ-অনুষঙ্গ সৈয়দ শামসুল হকের মানসলোকে সঞ্চার করেছে আত্মমগ্ন-চেতনা, সমাজ-বিচ্ছিন্ন নৈঃসঙ্গ্যবোধ, রিরংসাজাত আত্মরতি এবং রোম্যান্টিক স্বপ্নবিলাস। সৈয়দ শামসুল হক, উপন্যাস-রচনার শুরু থেকেই, মানব-সম্পর্ক নির্মাণে 'লেবার' (Labour) নয়—বরং 'লিবিডো'কেই (Libido) প্রাধান্য দিয়েছেন। আলোচ্য পর্বে প্রকাশিত হয় তাঁর চারটি উপন্যাস—'এক মহিলার ছবি'

(১৯৫৯), 'দেয়ালের দেশ' (১৯৫৯), 'অনুপম দিন' (১৯৬২) এবং 'সীমানা ছাড়িয়ে' (১৯৬৪)। ঘটনাংশ-নির্বাচন এবং আঙ্গিক-পরিচর্যায় এ-সব উপন্যাস তাঁর সযত্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষরবাহী সন্দেহ নেই; কিন্তু জীবনের অখণ্ড রূপের উপলব্ধি এর কোনটিতেই খুঁজে পাওয়া যায়না। অথচ আমরা জানি, "ঔপন্যাসিকের কাজ অর্জুনের অস্ত্র পরীক্ষার কালে বিচ্ছিন্নভাবে পাখির মাথাটুকুকে দেখা মাত্র নয়। সমগ্রকে জানা ব্যতীত ঔপন্যাসিকের মুক্তি নেই। এবং বাস্তবের দ্বন্দ্বময় স্বরূপকে না উপলব্ধি করা পর্যন্ত সমগ্রকে ধারণা করাও সাধ্যাতীত।" ২৩

সৈয়দ শামসুল হকের 'এক মহিলার ছবি' দৃষ্টি-আকর্ষণী বিচিত্র বর্ণ-প্রলেপে অন্ত-অসঙ্গতিসম্পন্ন সমাজ-পরিবেশে লালিত-বর্ধিত এক মহিলার আত্মমগ্ন চেতনার ভঙ্গিময় কথকতা। দ্বৈত-ভালোবাসা এবং নারীর সন্তান-আকাঙ্ক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর 'দেয়ালের দেশ'। অবচেতন দ্বৈত-ভালোবাসার দ্বন্দ্ব কবিতাস্পর্শী শব্দস্রোতে রূপায়িত হয়েছে 'অনুপম দিন' উপন্যাসে। একদিন অপরাহ্ণ তিনটা থেকে পরদিন ভোর ছ'টা—এই পনের ঘণ্টার সময়-সীমায় বন্দী করে, যখন বাইরে পড়ছে একটানা বৃষ্টি, জরিনা-মাসুদ-রোকসানা-আলীজাহ্—এইসব সমাজবিচ্ছিন্ন চরিত্রের হৃদয়তল-উৎসারিত অন্তর্জ্বালা এবং সত্তাবিচ্ছিন্ন একাকিত্বের যন্ত্রণা শিল্পমূর্তি পেয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের 'সীমানা ছাড়িয়ে' উপন্যাসে। আত্মকেন্দ্রিকতা এবং মনোবিকলন যুদ্ধোত্তর পশ্চিমী উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য—এ-সব উপন্যাস তারই প্রভাবজাত। যন্ত্রণাদগ্ধ এবং নৈঃসঙ্গ্যতাড়িত মানুষের অন্ত-অসঙ্গতি উন্মোচনে সৈয়দ শামসুল হকের ভাষা উপমাবহুল, গীতময়, আবেগ-স্নিগ্ধ এবং কবিতা-সিক্ত। 'সীমানা ছাড়িয়ে' উপন্যাস থেকে এক উজ্জ্বল এলাকা :

> বিকেলে নাবলো বৃষ্টি। তখন উঠে এলো ছাদে। বড় বড় গাছ দোলানো, আকাশ নেভানো বৃষ্টি। কেবল দিগন্তের কাছে বলয়ের মতো একফালি উজ্জ্বলতা। আর বাতাস। নিম গাছের বড় ডালটায় দু'টো কাক ভিজে ভিজে সারা হচ্ছে। তার চারদিক থেকে কি একটা আয়োজন যেন ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠছে। জরিনার মনে হলো, এই তার আপন পৃথিবী।

> কতকাল ধরে সে অপেক্ষা করছে এমনি একটি বৃষ্টির—যে বৃষ্টি তাকে ধীরে ধীরে নিয়ে আসে ছাদে, যে বৃষ্টিতে ভেজা যায়; যে বৃষ্টির আড়ালে সাদেক, রোকসানা, আলীজাহ্ সবাই দূরে সরে যায়।[২৪]

সমাজ-প্রতিবেশে বন্দী একটি মেয়ের বাঁচার স্বপ্ন কিভাবে হারিয়ে গেল, যন্ত্রণা আর বেদনায় কিভাবে তার জীবন নিঃশেষিত হলো—এইসব কথা নিয়ে শওকত আলীর 'পিঙ্গল আকাশ' (১৯৬৩)। বিকৃতির ঊর্ধ্বে উঠে সুস্থ জীবনের কল্পনা এ-উপন্যাসেও হয়েছে অবরুদ্ধ। পশ্চিমী সাহিত্য-পাঠের প্রভাবজাত এ-উপন্যাসে উপেক্ষিত হলো সমাজ-সত্য; বাস্তবজীবন নয়, বরং ভঙ্গি-সর্বস্ব আত্ম-নিমজ্জন এবং অবক্ষয়ী জীবনচেতনাই এখানে পেল প্রাধান্য।

শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বৌ' (১৯৬২) উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে উপকূলবর্তী একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রাত্যহিক জীবন-ধারা। বিষয়-গৌরবে অভিনব 'সারেং বৌ' "বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিত সারেং জীবন-কাহিনীর প্রথমতম আলেখ্য।"[২৫] জীবিকার অন্বেষণে অসীম সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছে কদম সারেং, আর দারিদ্র্য ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিদিন সংগ্রাম করছে নবিতুন—এদের জীবনের আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ আর সংগ্রাম-সাহসের শব্দরূপ এ-উপন্যাস। কদম এবং নবিতুন চরিত্র-নির্মাণে লেখকের অসামান্য সাফল্য স্মরণে রেখেই এ-কথা বলতে হয়—শৈল্পিক নির্লিপ্ততার অভাব, রোম্যান্টিকতার হাতছানি এবং গীতিসুরের বাহুল্য উপন্যাসটির শিল্পমূল্য ক্ষুন্ন করেছে। উপন্যাসের সমাপ্তিতে ধ্বনিত হয়েছে আশায় উজ্জীবিত সংগ্রামী মানুষের সাহসী উচ্চারণ :

> দেখল চরের দূরপ্রান্তে সবুজ রেখা। আর দেখল কয়েক হাত দূরে বঙ্গোপসাগরের ঝিলিমিলি নীল। শান্ত সংযত আর সুন্দর। কদম বলল, আর একটু জিরিয়ে নে রে নবিতুন। হাঁটতে হবে অনেক দূর।[২৬]

পূর্ববাংলার উপকূলবর্তী দু'টি গ্রাম—বাকুলিয়া আর তালতলিকে কেন্দ্র করে রচিত শহীদুল্লা কায়সারের 'সংশপ্তক' (১৯৬৫) এক মহাকাব্যিক

উপন্যাস। স্রষ্টার সমাজচেতনা, ইতিহাসজ্ঞান এবং বৈদগ্ধ্যের স্বাক্ষরবাহী 'সংশপ্তক' উপন্যাস পূর্ববাংলার কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল শিল্পকর্ম। দুটি অখ্যাত গ্রামের জীবনধারাকে অবলম্বন করে নির্মিত হলেও, এ-উপন্যাসের পট বিস্তৃত হয়েছে পূর্ববাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে কলকাতা মহানগরী পর্যন্ত। উপন্যাসের বিশাল ক্যানভাসে উঠে এসেছে সামন্ত আভিজাত্যের শেষ নিঃশ্বাস, পূর্ববাংলার গ্রামজীবনের সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কালীন কলকাতা-জীবন এবং বিভাগকালীন ঢাকার চালচিত্র। চল্লিশের দশকের সংক্ষুব্ধ এবং কল্লোলিত পূর্ববাংলা 'সংশপ্তক' উপন্যাসে শব্দবন্দী যেন। স্রষ্টার ইতিহাসচেতনা এবং সমাজবাদী জীবনাদর্শের স্পর্শে উপন্যাসের চরিত্রগুলো উচ্চকিত হয়েছে দ্রোহে-বিদ্রোহে; বৃহত্তর জীবনানন্দের আকাঙ্ক্ষায় তারা বেছে নিয়েছে সংগ্রাম-সঙ্কুল পথ। 'মহাভারতে' যে সংশপ্তক সেনার উল্লেখ আছে, যাদের কপালে অঙ্কিত মৃত্যুর পাঞ্জা, তারা মরে তবু লড়ে যায়; তেমনি লড়ে আর মরে 'সংশপ্তক'-এ চিত্রিত পূর্ববাংলার সাহসী মানুষ। উপন্যাসের সমাপ্তিতে সকল বাধা-বিপত্তি-হতাশা-বেদনাকে ছাপিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বিজয়ের সূর্যমুখী আশা :

> বড়খালে জোয়ার এসেছে। জোয়ারের টানে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সাম্পান। কল্ কল্ জোয়ার বড় খালে। শাঁই শাঁই বাতাসের দাপা-দাপি বড় খালের বুকে, দখিন ক্ষেতে। সবকিছু ছাপিয়ে রাবুর কানে এসে বাজে শুধু একটি কথা—আমি আসব। আমি আসব।[২৭]

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার রূপকার সত্যেন সেনের উজ্জ্বল আবির্ভাব ঘটে আলোচ্য কালসীমায়। এ-পর্বে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাসসমূহ হচ্ছে 'ভোরের বিহঙ্গী' (১৯৫৯), 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ' (১৯৫৯), 'অভিশপ্ত নগরী' (১৯৬৭), 'পদচিহ্ন' (১৯৬৮), 'পাপের সন্তান' (১৯৬৯), 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' (১৯৬৯), 'আলবেরুণী' (১৯৬৯), 'পুরুষমেধ' (১৯৬৯), 'সাত নম্বর ওয়ার্ড' (১৯৬৯), 'কুমারজীব' (১৯৬৯), 'সেয়ানা' (১৯৬৯), 'উত্তরণ' (১৯৭০), 'মা' (১৯৭০) এবং 'একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে' (১৯৭১)। আমাদের পাতি-বুর্জোয়া সাহিত্য-জগতে সত্যেন সেন হতে পারেন স্বল্প-পরিচিত সাহিত্যিক; কিন্তু মার্কসবাদী সাহিত্যসৃষ্টিতে তাঁর অবদান কোন সূত্রেই বিস্মরণীয় নয়। মার্কসবাদের দিকে জনচেতনাকে জাগিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যে সত্যেন সেনের মতো অধিকসংখ্যক

উপন্যাস বাংলাদেশে আর কেউ লেখেননি। ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টিতেও বাংলা সাহিত্যে সত্যেন সেন সংযোজন করেছেন একটি নতুন মাত্রা। গতানুগতিক প্রেম-বর্ণনায় মানস-যাত্রা, কারা-জীবনের অভিজ্ঞতার রূপায়ণে সে-যাত্রায় অগ্রগমণ, আর শ্রেণী-সংগ্রামের চেতনায় আকাঙ্ক্ষিত উত্তরণ—এই হচ্ছে সত্যেন সেনের শিল্পী-মানসের ক্রমবিকাশ-রেখা।

সত্যেন সেনের 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ' কারা-জীবনের অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ; আর 'পদচিহ্ন' হচ্ছে পাকিস্তান-সৃষ্টির পরে হিন্দু-সম্প্রদায়ের স্বদেশ-ত্যাগের ইতিকথা। তাঁর 'পুরুষমেধ' ইতিহাস-আশ্রয়ী রূপক উপন্যাস। বৈদিক যুগে রাজা বৃষকেতু রোগমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় বরুণদেবের প্রসন্নতা লাভের উদ্দেশ্যে এক বছর বয়সী এক শূদ্র-শিশুকে বলি দিয়ে পুরুষমেধ-এর অনুষ্ঠান করলেন। দীর্ঘ দিন ধরে শোষিত-নির্যাতিত শূদ্রদের মধ্যে প্রভু-শ্রেণীর বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠছিলো, এই শিশু হত্যার মধ্য দিয়ে তা প্রতিবাদে-বিদ্রোহে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। দূর অতীতের এই কাহিনীর রূপকে সত্যেন সেন এখানে ধরতে চেয়েছেন ঔপনিবেশিক শাসনে বন্দী পূর্ববাংলার সংক্ষোভ-সংগ্রাম-দ্রোহ-বিদ্রোহের ইতিহাস। এ-প্রসঙ্গে লেখকের উক্তি স্মরণীয় :

> ধর্মীয় অন্ধতা ও অজ্ঞানতায় সমাচ্ছন্ন সেই স্মরণাতীত যুগকে বহু পিছনে ফেলে আমরা সামনে এগিয়ে এসেছি। পুরুষমেধ একটা বর্বর প্রথা, এ কথা আমরা সবাই বলব। কিন্তু জ্ঞানে বিজ্ঞানে আলোকিত আধুনিক জগতের মানুষ আমরা—আমরা কি সেই বর্বরতা থেকে মুক্ত? বিংশ শতাব্দীর সু-সভ্য যুগে ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে, জাতীয়তাবাদের নামে, শ্রেণী-স্বার্থের নামে যে জগৎ-জোড়া ব্যাপক পুরুষমেধ অনুক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে—হিংস্রতা, বীভৎসতা ও অমানুষিকতার দিক দিয়ে তা কি প্রাক্-সভ্যতা যুগের পুরুষমেধকে ছাড়িয়ে যায়না?··· সুদাস আর ইদার সন্তান খেতুর কথা বলতে বলতে আজকের দিনের আমাদের সমাজের নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক খেতুদের ভয়ার্ত করুণ মুখচ্ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তাদের কথা কেমন করে ভুলে থাকব?[২৮]

সত্যেন সেনের 'কুমারজীব' বৌদ্ধ-ধর্মের প্রচার-কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে লেখা ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস; আর 'আলবেরুণী' হচ্ছে মধ্যযুগে পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম জ্ঞানসাধক আলবেরুণীর জীবন ও জ্ঞানসাধনার কথকতা। 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' উপন্যাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে প্রাচীন বঙ্গের নিপীড়িত-বঞ্চিত-শোষিত কৈবর্তদের সংগ্রাম-সাহস আর বিদ্রোহের কাহিনী। তবে ইতিহাস-আশ্রয়ী সাহিত্য যেমন নয় অতীত সত্য-ঘটনার অবিকল অনুস্মৃতি, সেখানে যেমন থাকে ইতিহাসের সঙ্গে কবি-কল্পনার ঐশ্বর্য; সত্যেন সেনের এ-সব উপন্যাসেও তেমনি আছে ইতিহাসের অস্থি-মজ্জায় কল্প-লোকের সৌরভ।

সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী' এবং 'পাপের সন্তান' উপন্যাসদ্বয় কাহিনী-সূত্রে সম্পর্কিত; দুটি উপন্যাসেরই বিষয়াংশ বাইবেলের 'বুক অব দি প্রোফেট : যেরেমিয়া' খণ্ড থেকে সংগৃহীত।[২৯] রাষ্ট্রনেতা-ধর্মনেতা ও সমাজের অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে পরস্পর সন্দেহ-বিদ্বেষ, আবার সাধারণ মানুষকে শোষণের সময় এদের মধ্যেই ঐক্যবোধ, ধর্মের নামে পুরোহিত-শ্রেণীর অত্যাচার ও ভণ্ডামী, যিরূশালেমের সামাজিক বৈষম্য এবং দাস-শ্রেণীর বিদ্রোহ—অতীতের এই বিশাল ক্যানভাসে গড়ে উঠেছে 'অভিশপ্ত নগরী'র কাহিনী। যেরেমিয়ার মানবকল্যাণকামী সংগ্রাম কিভাবে ব্যর্থ হলো, আর ধ্বংস হলো যিরূশালেম নগরী—তা নিয়েই সত্যেন সেনের এই মহৎ শিল্পকর্ম। 'পাপের সন্তান' উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে য়িহুদি জাতির পতনের ইতিহাস। য়িহুদি সমাজপতিদের ধর্মীয় গোঁড়ামী ও রক্ষণ-শীল মনোভাব, মানবিকতার পরিবর্তে শাস্ত্রীয়-বিধানের জয়গান, উগ্র জাতীয়তাবাদী-চেতনা এবং পরজাতি-বিদ্বেষ য়িহুদি জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেল—দূরতম এই ইতিহাস নিয়ে রচিত হয়েছে 'পাপের সন্তান'। সত্যেন সেন-ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক—যিনি বাইবেলের কোন কাহিনী নিয়ে রচনা করেছেন শিল্প-সফল উপন্যাস। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত স্মরণীয় :

> সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী' এবং 'পাপের সন্তান' এক উচ্চাশী সাহিত্য প্রয়াসের দুটি খণ্ড।...এ ধরনের উচ্চাশী ঐতিহাসিক উপন্যাস বাংলাভাষায় বিশেষ লেখা হয়নি। ঘটনার

কাল খৃষ্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতক, স্থান যিরূশালেম, কাহিনী ওল্ড টেস্টামেন্ট——প্রাচীন বাইবেলের 'যেরেমিয়া' অধ্যায় থেকে গৃহীত। স্বভাবতই হাউয়ার্ড ফাস্ট প্রমুখ লেখকদের বাইবেল-ভিত্তিক উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। বাংলায় এ-ধরনের উপন্যাস এই প্রথম। সম্পূর্ণ নোতুন, স্বাদে বৈচিত্র্যে অভিনব।[৩০]

পদ্মাপারের গ্রামের ছেলে মালেক——ধমনীতে যার ছিল গ্রামীণ জোতদারের রক্ত, অস্তিত্ব জুড়ে ছিল ভয়-ভীতি আর দ্বিধা-সংশয়——কলকাতার ময়দানে মে-দিনের জনসমুদ্র, শ্রমিকশ্রেণীর ইস্পাত-দৃঢ় সংগ্রাম আর সাধারণ মানুষের সাহচর্যে এসে হয়ে-ওঠে রাজনীতি-সচেতন সাহসী সূর্য-প্রতিম এক শ্রমিক——এই হচ্ছে সত্যেন সেনের দীর্ঘায়তন উপন্যাস 'উত্তরণ'-এর ঘটনাংশ। স্পষ্টতই এটি উদ্দেশ্যমূলক রচনা। সত্যেন সেন তাঁর সব উপন্যাসেই সচেতনভাবে মার্কসীয় রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরেছেন। 'অভিশপ্ত নগরী' এবং 'পাপের সন্তান' ব্যতীত কোন উপন্যাসেই সত্যেন সেন রূপকল্প-নির্মাণ কিংবা পরিস্রুত ভাষা-ব্যবহারে সচেতন নন——কখনো তাঁর উপন্যাস আক্রান্ত হয়েছে শৈল্পিক নিরাসক্তির অভাবে।

যেমন সত্যেন সেন, তেমনি জহির রায়হানও নিপীড়িত মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারে সংগ্রাম আর সচেতনতার আলো প্রজ্বলন এবং স্বদেশকে প্রাগ্রসর করার আন্তরগরজে উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উপন্যাসে মার্কসীয় জীবনভাবনা আর শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম-সাহস-সাফল্যই বার বার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ষাটের দশকে যখন আমাদের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক——কখনো ভয়ের কাছে নতি স্বীকার করে, আবার কখনো বা জাগতিক মোহের কাছে—ভুলে গেলেন সমাজসত্য আর যুগ-সংক্ষোভ, তখন সমাজ-সতর্ক এবং রাজনীতি-সচেতন জহির রায়হান ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লেখনী ধরেছেন, হয়ে-উঠেছেন একজন দায়িত্ববান নির্ভীক শিল্পী। তাঁর 'শেষ বিকেলের মেয়ে' (১৯৬০) রোম্যান্টিক প্রেমের গল্প; তবে কাহিনী-গ্রন্থণে অসতর্কতা ও অসংলগ্নতার জন্যে এটি অন্তরধর্মে দুর্বল রচনা। জহির রায়হানের 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪) উপন্যাসে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে হাজার বছরের সীমানায় প্রসারিত 'আবর্তন-সঙ্কুল অথচ বিবর্তনহীন' পূর্ববাংলার গ্রামীণ-জীবন। বিষয়-ভাবনায় গৌরব-দীপ্র 'আরেক ফাল্গুন'

(১৯৬৯) জহির রায়হানের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বায়ান্নর রক্ত-স্নাত ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে এ-উপন্যাস। সামরিক-শাসনের নিগ্রহের মধ্যে বাস করেও, একুশের মর্মকোষ-উৎসারিত 'আরেক ফাল্গুন' পাঠ করে আমরা হয়ে-উঠি সাহসী মানুষ; আসাদ-মুনিম-রসুল-সালমার মতোই নির্ভীক-চিত্তে আমরাও বলে উঠি—'আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।' তাঁর 'বরফ গলা নদী' (১৯৬৯) অর্থনৈতিক কারণে বিপর্যস্ত ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের সামগ্রিক ভাঙনের শব্দচিত্র। প্রতীকধর্মী উপন্যাস 'আর কতদিন'-এ (১৯৭০) অবরুদ্ধ এবং পদদলিত মানবাত্মা সমস্ত ভয়-ভীতি অতিক্রম করে নবজাগ্রত জীবনচেতনায় স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। এ-উপন্যাসে জহির রায়হান আঁকতে চেয়েছেন পৃথিবীর অত্যাচারিত মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম-সাহস আর স্বপ্নের কথা। পূর্ববাংলায় ঔপনিবেশিক শোষণের চিত্র ছাপিয়ে 'আর কতদিন'-এ বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদ আর বর্ণবাদের ভয়াল রূপ হয়েছে উন্মোচিত :

> ওরা আমার ছেলেটাকে হত্যা করেছে হিরোশিমায়।
> ওরা আমার মাকে খুন করেছে জেরুজালেমের রাস্তায়।
> আমার বোনটাকে ধর্ষণ করে মেরেছে ওরা, আফ্রিকাতে।
> আমার বাবাকে মেরেছে বুখেনওয়াল্ডে গুলি করে।
> আর আমার ভাই। তাকে ওরা ফাঁসে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে।
> করেছে। কারণ সে মানুষকে ভীষণ ভালোবাসতো।[৩১]

জহির রায়হানের উপন্যাস প্রকরণ-পরিচর্যায় পরিস্রুত ও পরিমার্জিত নয়, কিন্তু জীবনার্থ এবং সমাজভাবনায় নিঃসন্দেহে প্রাগ্রসর এবং ইতিহাস-চেতনাসমৃদ্ধ। তাঁর শিল্পীসত্তায় সমাজবাদী-চেতনার সঙ্গে রোমান্টিক মানস-প্রবণতা উপ্ত করেছে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের বীজ, তাই তাঁর উপন্যাসকে কখনো করেছে অতি-নাটকীয়, কখনো সংক্ষুব্ধ সমকাল-বিচ্যুৎ, কখনো চরিত্র-চিত্রণে অবিশ্বস্ত, আবার কখনো বা শিল্প-সুষমিতিতে অসংলগ্ন। জহির রায়হানের উপন্যাসের ভাষা আবেগ-প্রবণ, চিত্রাত্মক, চিত্রনাট্যধর্মী এবং কবিতাস্পর্শী। যেমন, 'আরেক ফাল্গুন' থেকে এক উজ্জ্বল এলাকা :

> আকাশে মেঘ নেই। তবু, ঝড়ের সঙ্কেত।
> বাতাসে বেগ নেই। তবু, তরঙ্গ সংঘাত।

কণ্ঠে কণ্ঠে এক আওয়াজ, শহীদের খুন ভুলবো না। বরকতের খুন ভুলবো না। যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে। পৃথিবী কাঁপছে। ভূমিকম্পে চৌচির হয়ে ফেটে পড়ছে দিক-বিদিক।

শুধু উত্তর নয়। দক্ষিণ নয়। পূর্ব নয়। পশ্চিম নয়। যেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছাতে ছাতে, প্রতি ছাতে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-যুবক ফেটে পড়ছে চিৎকারে, শহীদ স্মৃতি অমর হোক।[৩২]

আনোয়ার পাশার প্রথম উপন্যাস 'নীড়-সন্ধানী' (১৯৬৮) আত্ম-জৈবনিক রচনা।[৩৩] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গে যে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্প ছড়িয়ে যায় এবং বিপর্যস্ত করে তোলে মানুষের সুস্থ-জীবন—সে-সমাজসত্যকে পটভূমি করে রচিত হয়েছে 'নীড়-সন্ধানী'। সাম্প্রদায়িক সংঘাত ভুলে গিয়ে মানুষে মানুষে গড়ে উঠুক নতুন মিলন-সেতু—এমনি একটি আশাবাদী উচ্চারণ উপন্যাসটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'নিষুতি রাতের গাথা'ও (১৯৬৮) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতার চিত্ররূপ। এ-উপন্যাসে তিনি পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে চিত্রিত করেছেন শ্রেণীচেতনার আলোকে, মানবিক দৃষ্টিকোণে। এই দুটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমরা সমকালীন পশ্চিম বাংলায় মুসলমানদের জীবনবিশ্বাস ও জীবনযন্ত্রনাকে প্রত্যক্ষ করি। স্রষ্টার ব্যক্তি-অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই উপন্যাস দু'টির সাহিত্যিক-মূল্য হয়ত বেশী নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে এগুলো মূল্যবান সৃষ্টিকর্ম।

এ-পর্বে প্রকাশিত হয় আবু রুশদের তিনটি উপন্যাস—'ডোবা হল দীঘি' (১৯৬৬), 'নোঙর' (১৯৬৮) এবং 'অনিশ্চিত রাগিণী' (১৯৬৯)। আবু রুশদের উপন্যাসসমূহে প্রতিধ্বনিত হয়েছে মুসলিম-মধ্যবিত্তের সংস্কার-চেতনা ও চিত্তের প্রবঞ্চনা, নাগরিক-মধ্যবিত্তের আত্মগ্লানি ও জীবনবোধের দীনতা এবং দেশ-বিভাগোত্তর সময়ের সামাজিক সংকট। তাঁর 'ডোবা হল দীঘি'তে নেই জীবনার্থের গভীরতার কোন স্বাক্ষর, কিংবা ঘটনা-সংস্থান

ও প্রকরণ-পরিচর্যায় প্রত্যাশিত সতর্কতা। 'নোঙর' আবু রুশদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে এবং প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার যে-সব মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবার উদ্বাস্তু হল এবং পরে নতুন রাজধানী ঢাকায় স্থায়ী হল, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং দুর্ভোগের কাহিনী 'নোঙর' উপন্যাসে পরিচিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসটি একটি সংকট-কালের আবহ-চিত্র।'[৩৪]

আত্মকথনের ভঙ্গিতে লেখা রশীদ করীমের 'উত্তম পুরুষ' (১৯৬১) এবং 'প্রসন্ন পাষাণ' (১৯৬৩) তিরিশ-চল্লিশের যুগে কলকাতাবাসী মুসলিম মধ্যবিত্ত-সমাজের অন্তরঙ্গ ছবি। 'উত্তম পুরুষ'-এর নায়ক শাকের সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ এক তরুণ ; তার অনুভব-অভিজ্ঞতা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়েই গড়ে উঠেছে উপন্যাসের ঘটনাংশ। মহাযুদ্ধের পঙ্কস্রোতে হাজার বছরের লালিত মূল্যবোধের ভাঙন, মুসলিম মধ্যবিত্ত-সমাজের আত্মস্বাতন্ত্র্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা এবং রোম্যান্টিক প্রেমের পটে জীবন-অনুধ্যান---এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে 'উত্তম পুরুষ'। উপন্যাসের নায়ক শাকেরের কলকাতা থেকে ঢাকা আগমনের মধ্য দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে, ফলে উপন্যাসটি হয়ে পড়েছে জীবনের খণ্ডাংশের প্রতিচিত্র---এখানে নেই পরিপূর্ণ অখণ্ড জীবনচেতনা। এই অসংগতি আর অপরিণতি উপন্যাসের শিল্প-সিদ্ধিকে করেছে খণ্ডিত। রশীদ করীমের 'প্রসন্ন পাষাণ'-এ চিত্রিত হয়েছে একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত-নারীর জীবনচিত্র। নায়িকা তিশ্‌নার জীবন-অভিজ্ঞতা, পারিবারিক সঙ্কট, জটিল মনস্তত্ত্ব এবং প্রেম-আকাঙ্ক্ষা উন্মোচনে রশীদ করীম যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। ঔপন্যাসিকের শৈল্পিক-নিরাশক্তির অভাব এবং কাহিনী-গ্রন্থণে অসতর্কতা, চরিত্র-চিত্রণে সাফল্য সত্ত্বেও, 'উত্তম পুরুষ' এবং 'প্রসন্ন পাষাণ'-এর শিল্পমূল্য করেছে ক্ষুন্ন।

গ্রামীণ-পরিবেশে কাহিনীর সূত্রপাত হলেও আবদুর রাজ্জাকের 'কন্যা-কুমারী'তে (১৯৬০) শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে শহুরে কৃত্রিম জীবনধারা। অতি-নাটকীয়তা আর ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ 'কন্যাকুমারী'তে একই সাথে আছে সামন্ত-অবশেষের শেষ-নিঃশ্বাস, আবার উঠতি বুর্জোয়া-সমাজের জৌলুষ এবং শহুরে চাকচিক্য। 'কন্যাকুমারী'র কাহিনী সংহত নয়, এবং এটি আদি-অন্ত আক্রান্ত হয়েছে শৈল্পিক-সংযম ও পরিমিতিবোধের

অভাবে। চরিত্র-বিশ্লেষণে লেখকের সাফল্য অনস্বীকার্য, এবং এ-ক্ষেত্রে তিনি মনোযোগ দিয়েছেন চরিত্রের সেন্টিমেন্টের ওপর। বস্তুত, 'কন্যাকুমারী' একাধারে বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স এবং শরৎচন্দ্রের সেন্টিমেন্টের আধার।[৩৫]

এ-পর্বে বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের একটি অন্যতম প্রবণতা হচ্ছে ইতিহাস-আশ্রয়ী কাহিনীর রূপকল্প-নির্মাণ। ইবনে রশীদের 'ফাল্গুন করা' (১৯৫৮), মেসবাহুল হকের 'পূর্বদেশ' (১৯৬৩), আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' (১৯৬৩), বদরুদ্দীন আহমদের 'অরণ্য মিথুন' (১৯৬২), চৌধুরী শামসুর রহমানের 'মস্তানগড়' (১৯৬২), খালেক দাদ চৌধুরীর 'রক্তাক্ত অধ্যায়' (১৯৬৬), এবং পূর্বে আলোচিত সরদার জয়েনউদ্দীনের 'নীল রঙ রক্ত' (১৯৬৫), সত্যেন সেনের 'অভিশপ্ত নগরী' (১৯৬৭), 'পাপের সন্তান' (১৯৬৯), 'বিদ্রোহী কৈবর্ত' (১৯৬৯), 'পুরুষমেধ' (১৯৬৯) ও 'কুমারজীব' (১৯৬৯) প্রভৃতি এ-ধারার অন্যতম উপন্যাস। মোঘল আমলের শেষপাদে অন্যায়-অত্যাচার, অরাজকতা-অবিচার আর মগ-হার্মাদ-বর্গীর হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের শ্যামল প্রান্তরে, এসব অত্যাচার রোধকল্পে, একদা অমিত-পৌরুষ আর বিক্রম নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঐতিহাসিক চরিত্র শমসের গাজী। এই শমসের গাজীর জীবনের বিচিত্র-ঘটনা নিয়ে গড়ে উঠেছে মেসবাহুল হকের 'পূর্বদেশ'। দক্ষিণ বাংলার মগদের প্রাত্যহিক জীবন-যাপন উদ্ভাসিত হয়েছে বদরুদ্দীন আহমদের 'অরণ্য মিথুন' উপন্যাসে। তবে এখানে ইতিহাসের সঙ্গে মূল আখ্যান অনিবার্যভাবে সম্পর্কিত হয়ে উঠতে পারেনি।[৩৬] ফকির মজনু শাহের জীবন ও কীর্তি নিয়ে গড়ে উঠেছে চৌধুরী শামসুর রহমানের 'মস্তানগড়'। আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' রচিত হয়েছে দেড় শতাব্দী পূর্বের ওয়াহাবী আন্দোলনের পটভূমিকায়। ওয়াহাবী আন্দোলনের অন্যতম নেতা চুরুলিয়ার গুলাম নবী এ-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সমকালের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে ওয়াহাবী আন্দোলনকে একাত্ম করে দিয়েছেন লেখক, এবং এ-ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য বিস্ময়কর। শিল্প-সার্থকতার বিচারে ইতিহাস-আশ্রয়ী উপর্যুক্ত উপন্যাসগুলো যে-মূল্যই বহন করুক না কেন, পূর্ববাংলার উপন্যাস-সাহিত্যের ধারায় এগুলো নিঃসন্দেহে সংযোজন করেছে নতুন এক মাত্রা।

এ-পর্বে গ্রাম কিংবা বিশেষ কোন অঞ্চলের জীবন-চিত্র নিয়ে রচিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের তালিকাটি এ-রকম : তাসাদ্দুক হোসেনের 'মহুয়ার দেশে' (১৯৫৯), বদরুন্নিসা আবদুল্লাহ্‌র 'কাজল দীঘির উপকথা' (১৯৬২), আলাউদ্দীন খানের 'অববাহিকার উপকথা' (১৯৬৪) এবং জসীম উদ্‌দীনের' 'বোবা কাহিনী' (১৯৬৪)। মীজানুর রহমান শেলীর 'পাতালে শর্বরী' (১৯৬৫), নীলিমা ইব্রাহিমের 'বিশ শতকের মেয়ে' (১৯৫৯), দিলারা হাশেমের 'ঘর মন জানালা' (১৯৬৫), হুমায়ুন কাদিরের 'নির্জন মেঘ' (১৯৬৫), শহীদ আখন্দের 'পান্না হলো সবুজ' (১৯৬৫), নূরুল ইসলাম খানের 'রাজধানীর ইতিকথা' (১৯৬৪), আহসান হাবীবের 'আরণ্য নীলিমা' (১৯৬১)—প্রভৃতি উপন্যাসে ঔপনিবেশিক শাসনে অবরুদ্ধ পূর্ববাংলার অবিকশিত নগর-জীবনের বহুভুজ-জটিলতা এবং বিচিত্র জীবন-চেতনা উন্মোচিত হয়েছে।

আলোচ্য পর্বে রচিত উপন্যাসসমূহ গ্রামজীবন অতিক্রম করে ক্রমশ শহরমুখী হয়ে উঠেছে। তুলনা-সূত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের ঔপন্যাসিকরা গ্রামীণ-জীবনচিত্রণে যতটা স্বচ্ছন্দ এবং বস্তুনিষ্ঠ, নগর-জীবনচিত্রণে ততটা নন।[৩৭] তিরিশের পশ্চিমবঙ্গীয় উপন্যাসের প্রভাবে এ-পর্বে নবীন ঔপন্যাসিকদের রচনায় এসেছে আধুনিক নাগরিকচেতনা, লিবিডো-তাড়িত মনোবিকলন এবং যুদ্ধোত্তর পশ্চিমী অবক্ষয়ী মূল্যবোধ। কিন্তু একই সাথে একথা এখানে স্মরণীয় যে, তিরিশের শ্রম আর সিদ্ধিকে এঁদের কেউই সাহিত্য-ক্ষেত্রে যথার্থভাবে অঙ্গীকার করতে পারেননি। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনে অবরুদ্ধ সংক্ষুব্ধ পূর্ববাংলার আর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সঙ্কটও এ-সময়ের উপন্যাসে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। পাকিস্তানোত্তর প্রথম দশকের তুলনায় এ-পর্বের ঔপন্যাসিকরা অনেক বেশী আঙ্গিক-সচেতন; বিষয়াংশ-নির্বাচন, ভাষা-ব্যবহার এবং প্রকরণ-পরিচর্যায় অধিকাংশ ঔপন্যাসিক পরীক্ষাপ্রবণ ও বৈচিত্র্যসন্ধানী। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালের এই উত্তরাধিকারের ওপরই নির্মিত হয়েছে বিদেশী শত্রুমুক্ত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের উপন্যাসসাহিত্য।

চার

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনে পরিমাণগত পরিবর্তনের সাথে চেতনার ক্ষেত্রেও ঘটেছে গুণগত বিকাশ। স্বাধীনতার সোনালি প্রভায় আমাদের মন আর মননে যে নতুন চেতনা জাগ্রত হয়েছে, উপন্যাসে তার প্রতিফলন ছিল একান্তই প্রত্যাশিত। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক যুদ্ধোত্তর জাতীয় হতাশা এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শব্দচিত্র অঙ্কনেই হলেন অধিক আগ্রহী ; দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আর উত্তরণের কথাচিত্র নির্মাণে তাঁরা মোটেই উৎসাহী নন। এ-কারণেই নঞর্থক জীবনভাবনায় বিশ্বাসী কতিপয় ঔপন্যাসিক মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক উপন্যাস নির্মাণ করতে গিয়েও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিতে কেবল চিত্রিত করেন পাকিস্তানি ঘাতক সৈন্য-কর্তৃক নারী-ধর্ষণের অনুপুঙ্খ বিবরণ। তবে এ-পর্বের উপন্যাসে আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ে জড়িয়ে আছে সংগ্রাম ও বিজয়ের অবিমিশ্র অভিব্যক্তি, যা একান্তই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার। যুদ্ধোত্তর-সময়ে মূল্যবোধের অবক্ষয়, সর্বব্যাপী হতাশা, নৈরাজ্য এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে মহৎ শিল্পীমানস অনুসন্ধান করে জীবন ও শিল্পের জন্য সদর্থক এবং আলোকোজ্জ্বল এক মানস-ভূমি— কোন কোন ঔপন্যাসিকের রচনায় এ-জাতীয় অভিজ্ঞান মুক্তিযুদ্ধোত্তর উপন্যাসসাহিত্যের আশাব্যঞ্জক দিক।

স্বাধীনতা-যুদ্ধে নিহত আনোয়ার পাশা সংগ্রাম-সঙ্কুল সময়ে রচনা করেন মুক্তিযুদ্ধ-ভিত্তিক উপন্যাস 'রাইফেল রোটি আওরাত' (১৯৭৩)। এখানে আছে ঔপন্যাসিকের আত্মজৈবনিক উপাদান এবং এর নায়ক সুদীপ্ত শাহিন আনোয়ার পাশারই প্রতিচ্ছবি যেন। সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় এবং শ্রেণীচরিত্র অতিক্রম করে সুদীপ্ত শাহিন সামিল হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের রক্তিমস্রোতে। আত্ম-সমীক্ষা থেকে বিপ্লবীচেতনায় নায়কের এই উত্তরণ বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যে সংযোজন করেছে নতুন মাত্রা। একাত্তরের মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকায় পাক-বাহিনীর বর্বর হত্যাকাণ্ড আর বহ্ন্যুৎসবকে কেন্দ্র করে লেখা এ-উপন্যাস একদিকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলিল, অপরদিকে আবেগসিক্ত সার্থক সাহিত্যকর্ম। উপন্যাসের নায়ক সুদীপ্ত শাহিন কাহিনীর সমাপ্তিতে হয়ে-ওঠে নির্ভীক সাহসী মানুষ ;

চরম বিপর্যয় আর রক্তস্রোতের মধ্যে অবস্থান করেও শেষ পর্যন্ত তার কণ্ঠ থেকে ভেসে-ওঠে এগিয়ে যাওয়ার মা ভৈঃ বাণী :

> পুরোনো জীবনটা সেই পঁচিশের রাতেই লয় পেয়েছে। আহা, তাই সত্য হোক। নতুন মানুষ, নতুন পরিচয় এবং নতুন একটি প্রভাত। সে আর কতোদূরে ? বেশী দূর হ'তে পারে না। মাত্র এই রাতটুকু তো ! মা ভৈঃ। কেটে যাবে।[৩৮]

মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গে শওকত ওসমান লিখেছেন চারটি উপন্যাস—'জাহান্নম হইতে বিদায়' (১৯৭১), 'নেকড়ে অরণ্য' (১৯৭৩), 'দুই সৈনিক' (১৯৭৩) এবং 'জলাঙ্গী' (১৯৭৬)। 'দুঃখিনী জননী বাংলাদেশ ও তার বীর সন্তান মুক্তিফৌজদের জন্য' উৎসর্গিত 'জাহান্নম হইতে বিদায়' উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে একাত্তরে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বর্বরতা, মানুষের অসহায়তা এবং বাঙালির প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চিত্র। এ-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রৌঢ় শিক্ষক গাজী রহমান শওকত ওসমানেরই বিবেক যেন। তাঁর 'নেকড়ে অরণ্য' আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রীয় বিষয়ভিত্তিক কোন ঘটনা নয়; এবং এখানে নেই কোন যুদ্ধের ছবি, কোন মুক্তিযোদ্ধার অসীম বীরত্বের কথা কিংবা বিজয়ের উল্লাস—বরং আছে, সমস্ত উপন্যাস জুড়েই আছে, নারী-ধর্ষণের স্ফুল বিবরণ। যুদ্ধকালীন সময়ে পাকিস্তানি বর্বর সৈন্যদের বিরংসাবৃত্তির শিকার কতিপয় বন্দিনী নারীর জীবন-যন্ত্রনার আলেখ্য এ-উপন্যাস। তবে স্রষ্টার সুগভীর জীবনবোধের অভাবে 'নেকড়ে অরণ্য' শেষ পর্যন্ত পরিণত হয়েছে পাকিস্তানি সৈন্যদের নারী-ধর্ষণের অনুপুঙ্খ বিবরণে; তাঁর অভিজ্ঞতাহীনতার কারণেই এখানে ফুটে-ওঠেনি বন্দিনী নারীদের জীবনবেদনার গভীরতা। হাজী মখদুম মৃধা নামক জনৈক রাজাকারের দালালী এবং শেষ পর্যন্ত তার বিপর্যয় নিয়ে গড়ে-উঠেছে শওকত ওসমানের 'দুই সৈনিক'। যেমন সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' (১৯৭৬) নামক কাব্যনাট্যে, তেমনি শওকত ওসমানের এ-উপন্যাসেও, আমরা সীমিত মনোযোগেই লক্ষ্য করি, স্রষ্টার সর্বজ্ঞ-সহানুভূতি বর্ষিত হয়েছে পাক-বাহিনীর দালাল রাজাকার-আলবদরদের ওপর। 'জলাঙ্গী' উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে এক ভীরু মুক্তিযোদ্ধার ছবি, যার কাছে যুদ্ধের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে প্রেম এবং অবশেষে নিহত হয়েছে রাজাকারের হাতে। শওকত

ওসমানের কোন উপন্যাসেই একাত্তরে বাঙালির রক্তিম উজ্জীবনের ইতিহাস নেই, শরীর থেকে বেরিয়ে-আসা বারুদের গন্ধ নিয়ে কোন মুক্তিযোদ্ধা তাঁর উপন্যাসের নায়ক হতে পারেনি; মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গে তিনি এঁকেছেন কিছু খণ্ডচিত্র মাত্র।

শওকত আলীর 'যাত্রা' (১৯৭৬) উপন্যাসে একাত্তরের পঁচিশে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পাশবিক আক্রমণে ভীত ঢাকা শহরের বিচিত্র-শ্রেণীর মানুষ গ্রামের পথে যাত্রা করেছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। প্রথম অবস্থার ভয়-ভীতি-দ্বিধা-সংশয় কাটিয়ে মৃত্তিকাসংলগ্ন সংগ্রাম-শীল গ্রামীণ মানুষ অচিরেই হয়ে-ওঠে এক একজন মুক্তিযোদ্ধা, তাদের মধ্যে জেগে-ওঠে প্রতিরোধের দুর্নিবার সাহস। পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের অগ্নিকুণ্ডে থেকেও এ-উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনেছে; অধ্যাপক হাসানের সংলাপে ধরা পড়েছে এই আশাবাদ :

> আশাবাদী না হয়ে যে আমাদের গত্যন্তর নেই।··· আমাদের কাছে এখন দুটি মাত্র পথ—হয় মৃত্যু নয়তো লড়াই। যেহেতু একটা জাতি মরে যেতে পারে না—সেহেতু তাকে লড়াই করতেই হবে। আর জয়ের আশা না থাকলে কেউ লড়াই করতে পারে না। যেহেতু আমরা মরে যেতে পারি না সেহেতু আমাদের জয়ী হতেই হবে। এখন আমাদের জীবনের আরেক নাম হয়ে উঠেছে স্বাধীনতা।[৩৯]

সৈয়দ শামসুল হকের 'নীল দংশন' (১৯৮১) ও 'নিষিদ্ধ লোবান' (১৯৮১) নামক উপন্যাসোপম রচনা দুটি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাঙালি জাতিসত্তার সামগ্রিক জাগরণ নয়, বরং একটি খণ্ডিত পরিচ্ছেদের শব্দরূপ। 'নিষিদ্ধ লোবান'-এ লেখক সংগ্রাম আর বিজয়ের চিত্র নয়, বরং পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরংসাবৃত্তির উল্লাস অঙ্কনেই অধিক উৎসাহী। যুদ্ধোত্তর সময়ের পটভূমিতে রচিত সৈয়দ শামসুল হকের 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী'তে[৪০] স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে এসেছে গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের কথা, এবং এটি অনেকটা পরিণত সৃষ্টি। উপন্যাসের নায়ক শিক্ষক তাহের এ-সত্যে আশ্বস্থ হয় যে, মুক্তিসংগ্রাম একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরেই শেষ হয়ে যায়নি, কারণ সমাজে

এখনো আছে অশুভ শক্তির পাঁয়তারা। তাই তাহেরের আত্মোপলব্ধিতে জ্বলে-ওঠে প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা :

> সে জানে, মৃতদের ফিরিয়ে আনা অসম্ভব, কিন্তু মৃতের প্রতিশোধ গ্রহণ তো সম্ভব ? ঘটনা যখন অরণ্যের রীতিতে ঘটে তখন সেই একই রীতিতে তার উপসংহারও টানতে হয়। না, তাহের যেন আর না বলে যে, হত্যা অনুমোদনযোগ্য নয়। আর শুধু প্রতিশোধই নয়, সংগ্রামের এ-এক আবশ্যিক পর্যায়। সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি, দেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই দেশ থেকে এক লহমায় অশুভ শক্তিসমূহ অন্তর্হিত হয়নি : এখনো অস্ত্র ধারণ করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সম্ভবত আগের চেয়ে, মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ের চেয়ে, এখনই প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি করে রয়েছে।[৪১]

এ-উপন্যাসের ভাষারীতি প্রায়শই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'চাঁদের অমাবস্যা'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নায়ক তাহেরের অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসু মানসিকতা উন্মোচনে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এক্সপ্রেশনিস্টিক পরিচর্যা। যেমন :

> এতক্ষণ পর যেন নিমজ্জমান চেতনা একটা অবলম্বন খুঁজে পায়; তাহের অবিলম্বে সেটা আঁকড়ে ধরে, অচিরে তার কপাল স্থাপিত হয় টেবিলে এবং টেবিল একটা ভাসমান নৌকোর মতো সহসা দুলে উঠে দিগন্তের দিকে ধাবিত হয় অত্যন্ত সাবলীল গতিতে।[৪২]

গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত সেলিনা হোসেনের (১৯৪৭—) 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৭৬) উপন্যাসে উঠে এসেছে একাত্তরের গ্রামীণ জীবনের আলোড়ন-সংক্ষোভ-স্বপ্ন। উপন্যাসের নায়িকা বুড়ি মুক্তিযুদ্ধে উৎসর্গ করেছে প্রাণ-প্রতিম সন্তানকে, এবং এভাবেই সে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে পৌঁছে গেছে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের রক্তিম-স্রোতে। হলদী গাঁয়ের নিস্তরঙ্গ জীবনধারায় বেড়ে-ওঠা বুড়ি মুক্তিযুদ্ধের রক্তস্রোতে অবগাহণ করে হয়ে-ওঠে সূর্য-প্রতিম। বুড়ির অপর নাম মুক্তির আকাঙ্ক্ষা— ও যেন হাজার লক্ষ সন্তানহারা গর্বিতা মাতৃভূমির শাশ্বত শিল্প-প্রতিমা।

এক রইসের মা থেকে বুড়ির উজ্জ্বল উত্তরণ ঘটে, ও হয়ে-যায় লক্ষ রইসের সর্বজনীন মা :

> নিঃসীম বুকের প্রান্তরে হু হু বাতাস বয়ে যায়। বুড়ি হাজার চেষ্টা করেও কাঁদতে পারেনা। ছুটে বেরুতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে। আরো দু'টো প্রাণ ওর হাতের মুঠোয়। ও ইচ্ছে করলেই এখন সে প্রাণ দু'টো উপেক্ষা করতে পারেনা। বুড়ির সে অধিকার নেই। ওরা এখন হাজার হাজার কলীমের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছে। ওরা হলদী গাঁর স্বাধীনতার জন্যে নিজের জীবনকে উপেক্ষা করে লড়ছে। ওরা আচমকা ফেটে যাওয়া শিমূলের উজ্জ্বল ধবধবে তুলো। বুড়ি এখন ইচ্ছে করলেই শুধু রইসের মা হতে পারে না। বুড়ি এখন শুধুমাত্র রইসের একলার মা নয়।[৪৩]

যুদ্ধকালীন সময়ে নাগরিক মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের সংকট, আশা-নিরাশার সংশয় এবং চেতনাগত অন্তর্দ্বন্দ্ব শব্দরূপ পেয়েছে রশীদ হায়দারের (১৯৪১—) 'খাঁচায়' (১৯৭৫) উপন্যাসে। এ-উপন্যাসে খাঁচায় বন্দী একটি টিয়ে পাখির মুক্ত হওয়ার প্রতীকী ব্যঞ্জনায় প্রতিভাসিত হয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের শৃংখল থেকে বাংলাদেশের মুক্তির কথা, স্বাধীনতার কথা। আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যে অভিনব 'অন্ধ কথামালা' (১৯৮২) উপন্যাসে রশীদ হায়দার মুক্তিযুদ্ধের সময় গ্রামীণ মানুষের আত্মিক জাগরণ যেমনি তুলে ধরেছেন, তেমনি উপস্থিত করেছেন পাকিস্তানের দালালদের হীন ষড়যন্ত্র ও অত্যাচারের কাহিনী। টুয়েন্টি নাইন খেলতে খেলতেই গ্রামের একদল যুবক মিলিটারী আসার সংযোগ-সেতু উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করে, কিন্তু তাদেরই একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় তা ব্যর্থ হয়ে যায়; ধরা পড়ে পরিকল্পনার অন্যতম সাথী বেলাল হোসেন। এই বেলাল হোসেনকে যখন বন্দী অবস্থায় চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বধ্যভূমির দিকে, সে-সময়কার তার বিচিত্র অনুভূতি আর স্মৃতি নিয়ে গড়ে-উঠেছে এ-উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিগর্ভ দিনের কাহিনী হলেও, ফ্লাস-ব্যাকে এ-উপন্যাসে উঠে-এসেছে গ্রামীণ সংগ্রামশীল মানুষের যাপিত-জীবন, ধরা পড়েছে সামন্ত-শাসক ও ক্ষমতাবানদের শোষণের চিত্র। 'নষ্ট জোছনায়' এবং 'এ কোন অরণ্য'

শীর্ষক দুটো উপন্যাসোপম রচনার যুগলবন্দী-রূপ রশীদ হায়দারের 'নষ্ট জোছনায় এ কোন অরণ্য' (১৯৮২)। তাঁর 'নষ্ট জোছনায়' চিত্রিত হয়েছে যুদ্ধোত্তরকালের সর্বব্যাপী হতাশা, সমাজের নানা ভাঙচুর ও বিপর্যয় এবং মুক্তিযোদ্ধাদের চৈতন্যের পরাভব ও বিপথগামিতা। যে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধের শুরুতে 'শূন্যে বজ্রমুষ্ঠি তুলে বলতো, ' এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর যে-স্বাধীনতা পেয়েছি তা আমাদের এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে, যে-শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে উঠবে তাতে আর কোনদিন হানাহানি হবে না'[৪৪]—যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, তাদের শরীর থেকে বারুদের গন্ধ মুছে যেতে-না-যেতেই, কেন তারা বিপথগামী হলো এই অনিবার্য রক্তাক্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে এ-উপন্যাসে। তবে উপন্যাসের সমাপ্তিতে, রুবীর দৃষ্টিকোণে, ঔপন্যাসিক মুক্তিযোদ্ধাদের পুনরায় জেগে-ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন এবং এখানেই এ-উপন্যাসের বিশিষ্টতা।

একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হলেও মাহমুদুল হকের (১৯৪০—) 'জীবন আমার বোন' (১৯৭৬) উপন্যাস লিবিডো-তাড়িত ও নিষ্ক্রিয় রোম্যান্টিকতা-আক্রান্ত নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন-যন্ত্রণারই শব্দরূপ; এখানে নেই সাহসে জ্বলে-ওঠা কোন মুক্তিযোদ্ধার কথা, কোন প্রতিরোধের কাহিনী। বাঙালির রক্তিম উজ্জীবনের সময়ও যেহেতু মাহমুদুল হকের নায়ক খোকার 'পলায়ন ছাড়া কোন ভূমিকা নেই', তাই তার বিকৃত মানসিকতায় অর্ধেন্দু দস্তিদার-প্রীতিলতা-আনোয়ারা-মতিয়ুরের বাংলাদেশ হয়ে-যায় 'একটা বাংলামদের বোতল', 'সস্তা মদের দোকান', 'ছমছমে ঘুটঘুটে বেশ্যালয়', 'লক্ষ বছরের বেতো ডাইনী মাসি' ইত্যাদি ইত্যাদি।[৪৫] তাঁর 'অশরীরী' এবং 'মাটির জাহাজে'ও আছে মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ; কিন্তু কোন উপন্যাসেই মাহমুদুল হক মুক্তিযুদ্ধের সদর্থক-চেতনা প্রকাশে প্রয়াসী নন।

বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তি-যুদ্ধ—এই বিস্তৃত পটভূমিতে বিন্যস্ত 'আমার যত গ্লানি' (১৯৭৩) উপন্যাসে রশীদ করীম বাঙালি জাতিসত্তার সামগ্রিক জাগরণ-উন্মোচনে মোটেই আগ্রহী নন; তাই মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ ধারণ করেও 'আমার যত গ্লানি' পরিণত হয় উত্তম-পুরুষের জবানীতে স্রষ্টার আত্মধিক্কার এবং ব্যক্তিজীবনের

গ্লানিময় আলেখ্যে। রাবেয়া খাতুনের (১৯৩৫-) 'ফেরারী সূর্য' (১৯৭৪) উপন্যাসের কাহিনী গৃহীত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালীন নাগরিক জীবন থেকে; এবং এখানে আছে যুদ্ধের কথা, প্রতিরোধের কথা, পশুশক্তির বর্বরতার কথা। তবে ভাষারীতি এবং আঙ্গিকগত দুর্বলতার কারণে এটি হতে পারেনি উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পকর্ম। আমজাদ হোসেনের (১৯৪২--) 'অবেলায় অসময়' (১৯৭৫) উপন্যাসে পাক-বাহিনীর আক্রমণে ভীত কতিপয় গ্রামীণ নর-নারী এক মাঝির নৌকোয় ভেসে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে; এবং এ-যাত্রাপথেই তারা দেখেছে গ্রামবাংলার বীভৎস ধ্বংস-চিত্র, অনুভব করেছে গণমানুষের চৈতন্যের জাগরণ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানে আটকে-পড়া বাঙালি সরকারি কর্মচারীদের বন্দী-মানসের শব্দরূপ মিরজা আবদুল হাই-এর 'ফিরে চলো' (১৯৮১) উপন্যাস। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কেন্দ্রীয় বিষয়ভিত্তিক না-হলেও, এ-উপন্যাসে ধরা পড়েছে প্রবাসী বাঙালির দুর্নিবার স্বদেশপ্রীতির কথা। এই দেশপ্রেমের জন্যেই, আইনের নিগড় আর প্রতিকূল পরিবেশের বেড়াজাল ডিংগিয়ে, হিমাংকের নীচে তাপমাত্রা সত্ত্বেও, বন্দী-বাঙালি সাহসী হয়ে উঠেছে হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে স্বদেশযাত্রায়।

বাংলাদেশ এবং যুগোশ্লাভিয়ার মুক্তিসংগ্রামের পটভূমিতে রচিত হয়েছে হারুন হাবীবের 'প্রিয়যোদ্ধা, প্রিয়তম' (১৯৮২) উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, বিজয়ের উল্লাস আর ত্যাগের মহিমা যেমন ছড়িয়ে আছে এ-উপন্যাসে, তেমনি আছে হাসান-ইয়াসমিনকার রোম্যান্টিক প্রেমের প্রতীকে শাশ্বত বিশ্বজনীনতা। উপন্যাসের নায়ক, যার বুকের পাঁজরে লুকিয়ে আছে পাক-বাহিনীর বুলেট, হাসানের আবেগসিক্ত সংলাপে ধ্বনিত হয়েছে একাত্তরে বাঙালি জাতিসত্তার রক্তিম উজ্জীবনের রৌদ্রোজ্জ্বল চেতনা :

> একাত্তরের মৃত অথবা জীবিত স্বাধীনতা সংগ্রামী আবুল হাসানরাই বাংলাদেশ। এ সত্যের মৃত্যু মানেই-তো বাঙ্গালীর ইতিহাস থেকে একাত্তর সালটা নেই। নেই, পল্টন ময়দান, ঘেরাও আন্দোলন, নেই রেসকোর্স উদ্যানের স্বাধীনতা-পাগল জনতা, নেই ২৫শে মার্চের কালো রাত, নেই তেইশ বছরের পাকিস্তানী দুঃশাসন-বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, নেই সাভার-এর জাতীয় শহীদ

মিনার, মীরপুরের বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ। বায়ান্ন থেকে সত্তরের যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসই বাংলাদেশ।[৪৬]

উল্লিখিত উপন্যাসসমূহে ছড়িয়ে আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ, তবে এর কোনটিই মুক্তিযুদ্ধের সময় সম্মিলিত বাঙালির চৈতন্যের জাগরণকে যথাযথভাবে অঙ্গীকার করতে পারেনি। এর কারণ বহুবিধ। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধ-প্রসঙ্গে আমাদের ঔপন্যাসিকদের ধারণা অভিজ্ঞতা-পরিপ্লুত নয়, বরং স্মৃতি আর শ্রুতি নির্ভর। তাই মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গে তাঁদের উপন্যাস-সমূহেও নেই প্রত্যক্ষ উত্তাপের স্পর্শ; অধিকাংশ উপন্যাসই স্মৃতিচারণ-মূলক, কল্পনানির্ভর কিংবা আবেগ-উচ্ছ্বাসের মনোময় কথকতা। দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধোত্তর জাতীয় হতাশা আর বিপর্যয় থেকে উজ্জ্বল উত্তরণের দিকে পথ-নির্দেশ নয়, বরং সর্বব্যাপী হতাশা আর 'নিখিল নাস্তি'র গর্ভে বিলীন হতে চাইলেন আমাদের ঔপন্যাসিকরা এবং এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের অনিঃশেষ-অবিনাশী চেতনা খণ্ডিত ও বিপথগামী হলো। তৃতীয়ত, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বল্পস্থায়িত্ব এটিকে যথার্থ জনযুদ্ধে পরিণত হতে দেয়নি, ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাও হয়নি সর্বব্যাপ্ত এবং এরই শিকার, অধিকাংশ বাঙালির মতো, বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরাও। এ-কারণেই একটি স্বাধীন জাতির সুদূরস্পর্শী স্বপ্ন ও পরিকল্পনা শিল্পে-সাহিত্যে যথার্থভাবে হলো না রূপায়িত। চতুর্থত, এবং সম্ভবত এটিই প্রধান কারণ, মুক্তিযুদ্ধ এখনো অত্যন্ত কাছের একটি ঘটনা, এবং এ-জন্যই অধিকাংশ ঔপন্যাসিকের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আবেগ-উচ্ছ্বাস তাড়িত, সেখানে স্বভাবতই ফুটে ওঠে শৈল্পিক নিরাসক্তির অভাব। সময়-পেরিয়ে যখন আসবে নতুন প্রজন্মের ঔপন্যাসিক, হয়ত তাঁর হাতেই লেখা হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে লেখা কালোত্তীর্ণ একটি উপন্যাস। এ-প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য, নেপোলীয়নীয় যুদ্ধের (১৮০৪-১৮১৫) অনেক পরেই রচিত হয়েছে লেভ টলস্টয়ের কালোত্তীর্ণ মহাকাব্যিক উপন্যাস 'ওয়ার এ্যান্ড পীস' (রচনাকাল: ১৮৬৫-৬৮)। গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিকতাকে ধারণ করে রচিত, বাঙালি জাতিসত্তার সম্মিলিত উজ্জীবনের মর্মমূল-উৎসারিত, কালজয়ী মহাকাব্যিক উপন্যাসটি এখনও অনাগত কালের প্রত্যাশামাত্র।

স্বাধীনতা-উত্তর উপন্যাসে আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেকটা কমেছে, তুলনামূলকভাবে বেড়েছে বিষয়ের বৈচিত্র্য। এ-পর্বে অধিকাংশ ঔপন্যাসিক

যুদ্ধোত্তর হতাশা-অবক্ষয় আর নৈরাজ্যের শব্দরূপ নির্মাণে সচেষ্ট হলেন; উৎসাহী হলেন যন্ত্রণা-দগ্ধ তারুণ্যের নষ্ট-জীবনের শিল্পমূর্তি সৃজনে। দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদে উচ্চকিত হবার পরিবর্তে অনেকেই যেতে চাইলেন হতাশার অন্তঃসারশূন্য অতল গহ্বরে; এবং সবাই মিলে লিখলেন একটি উপন্যাস, যার মৌল বিষয় নাস্তি—'নিখিল নাস্তি'।

'প্রেম একটি লাল গোলাপ,' (১৯৭৮), 'একালের রূপকথা' (১৯৮০) এবং 'সাধারণ লোকের কাহিনী' (১৯৮১) উপন্যাসত্রয়ে রশীদ করীম মূলত যুদ্ধোত্তর জাতীয় হতাশা ও বিপর্যয়ের শিল্পরূপ নির্মাণ করেছেন; সমাজ-সংলগ্ন ব্যক্তিজীবনের সুস্থ, সুন্দর এবং অখণ্ডরূপ তাঁর কোন উপন্যাসেই প্রতিবিম্বিত হয়নি। তাঁর 'প্রেম একটি লাল গোলাপ' উপন্যাস নাগরিক উচ্চবিত্ত জীবনের জটিলতা ও অবক্ষয়ের চিত্র; আর 'সাধারণ লোকের কাহিনী' হচ্ছে নাগরিক মধ্যবিত্তের নিত্যদিনের পাঁচালি। রশীদ করীমের উপন্যাসের ভাষা ও চরিত্রের কথা বলার ভঙ্গি সচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষরবাহী, এবং তাঁর উপন্যাস সাংগঠনিক দিক দিয়েও স্বাতন্ত্র্যের দাবীদার।

সৈয়দ শামসুল হকের 'খেলারাম খেলে যা' (১৯৭৩) উপন্যাস যৌনতার বিকার, মনোবিকলন এবং অস্বাভাবিক মানসিক-জটিলতার শিল্পরূপ। এ-উপন্যাসের নায়ক বাবর নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে লিবিডো-তাড়িত হয়ে; সে যৌনবিকারগ্রস্ত এবং পাতি-বুর্জোয়া জীবনদর্শনে আত্মস্থ। বাংলা-দেশের এক মফস্বল শহরের বিচিত্রশ্রেণীর মানুষ, তাদের কুসংস্কার, অস্তিত্বের সংকট, ভবিষ্যৎ স্বপ্নময়তা আর দ্বিধা-সংশয় নিয়ে গড়ে উঠেছে সৈয়দ শামসুল হকের 'দূরত্ব' (১৯৮১) উপন্যাস। আধুনিক মানুষের নৈঃসঙ্গ্যবোধ, বহুভুজ জটিলতা এবং মনস্তাত্ত্বিক বিকার উপস্থাপনে সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে অর্জন করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা। আঙ্গিক-নির্মিতি, ভাষা-ব্যবহার এবং প্রকরণ-প্রসাধনে পরীক্ষা-প্রিয় সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাস পাঠক-নন্দিত, সুখপাঠ্য এবং সুখদ।

সুদূর বেলুচিস্তান থেকে আসা, সম্রাট আকবরের এক সৈনাপত্য মুরাদ খানের বংশধরদের বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠার আধারে, ১৫৭৪ থেকে ১৯৪৭ সাল—এই প্রায় চারশত বছরের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস প্রতিচিত্রিত হয়েছে

রাজিয়া খানের 'প্রতিচিত্র' (১৯৭৬) উপন্যাসে। তবে আরম্ভ এবং পরিণতিতে অসংলগ্নতা উপন্যাসটির সাংগঠনিক ভিতকে করেছে দুর্বল। ষাটের দশকে বাংলাদেশে যে মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব এবং সত্তরের দশকে যাদের পূর্ণ বিকাশ, তাদের নৈতিক অধঃপতন, বিচ্যুতি, মূল্যবোধের অসঙ্গতি এবং একই সাথে মননশীলতা, রুচিবোধ ও আভিজাত্য অভিব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে রাজিয়া খানের 'হে মহাজীবন' (১৯৮৩) উপন্যাসে। সত্তাবিচ্ছিন্ন মানুষের নৈঃসঙ্গ্যবোধ উপস্থাপনে এবং মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা-বিশ্লেষণে রাজিয়া খানের উপন্যাস বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে অর্জন করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা।

সরদার জয়েনউদ্দীনের 'শ্রীমতী ক ও খ এবং শ্রীমান তালেব আলি' (১৯৭৩) স্বাধীনতা-উত্তর কালের মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং উপন্যাসের নায়ক শ্রীমান তালেব আলির বিকৃত যৌনাকাঙ্ক্ষা নিয়ে গড়ে উঠেছে। জয়েনউদ্দীনের 'বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ' (১৯৭৫) এ-পর্বের একটি উল্লেখ-যোগ্য উপন্যাস। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার গণ-আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত এ-উপন্যাস আমাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ-সংগ্রামের এক শিল্পিত দলিল। ব্যক্তিক সংকট এবং বিচ্ছিন্নতা নয়, বরং এখানে উঠে এসেছে কল্লোলিত চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে বাঙালির চৈতন্যের উত্তরণের কথা, উজ্জীবনের কথা।

'ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান' রচয়িতা আবুজাফর শামসুদ্দীন এ-পর্বে রচনা করেন মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' (১৯৭৪)। গ্রাম ও নগরের পটে বিস্তৃত এ-উপন্যাসে, খণ্ড-খণ্ড কাহিনীর আধারে, অভিব্যঞ্জিত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্য-পর্যায় পর্যন্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস। তবে যে-কেন্দ্রানুগ শক্তির আকর্ষণে এ-জাতীয় উপন্যাসে খণ্ড-খণ্ড চিত্র পূর্ণায়ত জীবন-বৃত্তে হয়ে-ওঠে অখণ্ড—তা 'পদ্মা মেঘনা যমুনা'র দুর্লক্ষ্য। তাঁর 'প্রপঞ্চ' (১৯৮০) আমাদের দেশের পেশাজীবী রাজনীতিবিদদের ভণ্ডামীর স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস। প্রগতিশীল চিন্তা ও চেতনার প্রকাশ থাকলেও, আবুজাফর শামসুদ্দীনের কোন উপন্যাসেই নেই প্রকরণ-পরিচর্যা ও আঙ্গিক-নির্মিতিতে প্রত্যাশিত প্রযত্নের ছাপ।

এ-পর্বে প্রকাশিত শওকত ওসমানের 'পতঙ্গ পিঞ্জর' (১৯৮৩) প্রতীকাশ্রয়ী রচনা। পঙ্গপালের আক্রমণে বিপর্যস্ত অখ্যাত গৌরগ্রাম এখানে স্বদেশের রূপক। পঙ্গপালের হাত থেকে মুক্তির জন্যে, বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন গৌরগ্রামের মানুষ অবশেষে সফল হয় 'পঙ্গপাল নিশ্চিহ্নকরণ অভিযানে'—তারা এগিয়ে আসে মশাল হাতে, যেন দীপালি-উৎসব চারদিকে। পঙ্গপাল ধ্বংসের রূপক-চিত্রে শওকত ওসমান জাতিক-আন্তর্জাতিক সামাজিক-পঙ্গপালদের অনিবার্য ধ্বংসের কথাই উচ্চারণ করেছেন এ-উপন্যাসে। বিষয়-গৌরবে বিশিষ্ট আহমদ ছফার 'ওঙ্কার' (১৯৭৫) এ-পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সময় নিপীড়িত বাঙালির জীবনাবেগের প্রেক্ষাপটে রচিত এ-উপন্যাসের শব্দস্রোতে প্রতীকী-ব্যঞ্জনায় বোবা-নায়িকা যেন হয়ে-ওঠে কণ্ঠরুদ্ধ শৃঙ্খলিত বাংলাদেশ।

দিলারা হাশেমের 'স্তব্ধতার কানে কানে' (১৯৭৭) উপন্যাসে কলকাতার বিরাশি নম্বর এ্যান্থনি বাগান লেনের এক পঙ্গু মেয়ে, নাম যার হুমায়রা, একে একে বলছে তার জীবনযন্ত্রণার কথা, তার গোপন অক্ষম প্রেমের কথা। প্রেমের সঙ্গে পঙ্গুত্বের দ্বৈরথে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হুমায়রার অতলান্তিক বেদনা উন্মোচনে এ-উপন্যাসে লেখক অর্জন করেছেন অসামান্য সাফল্য। মধ্যবিত্ত ঘরের এক মেয়ে, যে প্রত্যাশার সঙ্গে মেলাতে পারেনি প্রাপ্তির, স্বপ্নের সাথে সূর্যালোকের—সেই মেয়ে সায়েরা—তার নৈঃসঙ্গ্য আর বেদনার কথা নিয়ে দিলারা হাশেমের গীতল উপাখ্যান 'আমলকীর মৌ' (১৯৭৮)। রোম্যান্টিক প্রেমের আধারে 'স্তব্ধতার কানে কানে' উপন্যাসে আছে চলমান কলকাতার নিম্ন-মধ্যবিত্ত মুসলিম-জীবন; আর 'আমলকীর মৌ'-এ আছে, পার্শ্ব চরিত্রের জীবনচিত্রণ-সূত্রে, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি-অনুষঙ্গ।

শওকত আলীর 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' (১৯৮৪) এ-পর্বের একটি উল্লেখ-যোগ্য উপন্যাস। প্রায় আটশত বৎসর পূর্বে, লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে সামন্ত-মহাসামন্তদের অত্যাচার-অবিচার, অন্ত্যজ-প্রাকৃতজনের প্রতিরোধ আর তুর্কিদের বঙ্গ-বিজয়ের ফলে বাংলার সমাজে-সংস্কৃতিতে উঠেছিল যে ঊর্মিল আলোড়ন—সেই দূরায়ত ধূসর ইতিহাসের শিল্পিত-ভাষ্য এ-উপন্যাস। আজকের মতো, ইতিহাসের সেই প্রদোষকালেও, প্রাকৃতজনেরা

প্রতিনিয়ত শোষিত হয়েছে, তবু কখনো কখনো তাদের মধ্যে জেগেছে প্রতিরোধ-চেতনা ; সামন্তশাসক আর বহিশত্রুর বিরুদ্ধে সাহসী হয়ে-উঠেছে অন্ত্যজেরা, বৌদ্ধেরা—নতজানু দাসত্ব থেকে তারা চেয়েছে মুক্তি। উপন্যাসের নায়ক শ্যামাঙ্গ, যে একজন মৃৎশিল্পী, সামন্ত-মহাসামন্তের অভিরুচির কাছে নিজের শিল্পদৃষ্টির পরাভব মানতে পারেনি, এ-জন্যেই তাকে ছেড়ে দিতে হলো শিল্পের সাধনা ; তবু কালের সীমানা পেরিয়ে তার উত্তরাধিকার বেঁচে থাকে অনাগত সময়ের স্রোতে :

> যদি কোনো পল্লী বালিকার হাতে কখনো মৃৎপুত্তলি দেখতে পান, তাহলে লেখকের অনুরোধ, লক্ষ্য ক'রে দেখবেন, ঐ পুত্তলিতে লীলাবতীকে পাওয়া যায় কি না—আমাদের বিশ্বাস, কোনো-না-কোনো পুত্তলিতে অবশ্যই পাওয়া যাবে—আর যদি যায়, তাহলে বুঝবেন, ওটি শুধু মৃৎপুত্তলিই নয়, বহু শতাব্দী পূর্বের শ্যামাঙ্গ নামক এক হতভাগ্য মৃৎশিল্পীর মূর্ত ভালোবাসাও।[৪৭]

সেই তিনি, যাঁর নাম এ্যারিস্টটল (খ্রী. পূ. ৩৮৪—খ্রী. পূ. ৩২২), প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে যেমন বলেছেন—ইতিহাস হচ্ছে সত্য ঘটনার বিবরণ, আর ইতিহাস-আশ্রিত সাহিত্য হচ্ছে ইতিহাসের কঙ্কালের ওপর কবি-কল্পনার ঐশ্বর্য ;[৪৮] তেমনি শওকত আলীর এ-উপন্যাসেও আছে ইতিহাসের অস্থি-করোটিতে কল্পলোকের তনু-মন। তবে এই কল্পনায় নেই মনগড়া ইতিহাস, বরং আছে ইতিহাসের মনোময় বিন্যাস। এই উপন্যাসে ইতিহাসের উপাদান পরিণত হয়েছে শিল্পে এবং এ-ক্ষেত্রে লেখকের সাফল্য অনতিক্রান্ত। সমালোচক যথার্থই বলেছেন : 'গবেষণার সঙ্গে এই বইতে যুক্ত হয়েছে দরদ, তথ্যের সঙ্গে মিলেছে অন্তর্দৃষ্টি, মনোহর ভঙ্গির সঙ্গে মিশেছে অনুপম ভাষা।'[৪৯]

স্বাধীনতা-উত্তরকালে যে-সব নতুন ঔপন্যাসিকের আগমন ঘটেছে, রিজিয়া রহমান (১৯৩৯—) তাঁদের অন্যতম। বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং শৈল্পিক-উৎকর্ষে তাঁর উপন্যাসসমূহ বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে অর্জন করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা। রিজিয়া রহমানের উপন্যাসের তালিকাটি এ-রকম : 'ঘর ভাঙা ঘর'

(১৯৭৪), 'উত্তর পুরুষ' (১৯৭৭), 'রক্তের অক্ষর' (১৯৭৮), 'বং থেকে বাংলা' (১৯৭৮), 'অরণ্যের কাছে' (১৯৭৯), 'শিলায় শিলায় আগুন' (১৯৮০), 'অলিখিত উপাখ্যান' (১৯৮০), 'ধবল জ্যোৎস্না' (১৯৮১), 'সূর্য সবুজ রক্ত' (১৯৮১) এবং 'একাল চিরকাল' (১৯৮৪)। তাঁর 'ঘর ভাঙা ঘর' বস্তি-জীবনের ক্লেদাক্ত যন্ত্রণার শব্দরূপ; আর 'রক্তের অক্ষর' হচ্ছে নিষিদ্ধ পল্লীর যন্ত্রণাদগ্ধ প্রাত্যহিকতার ভাষাচিত্র। চট্টগ্রামে হার্মাদ জলদস্যুদের অত্যাচার এবং পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের দৈনন্দিনতা নিয়ে গড়ে-উঠেছে রিজিয়া রহমানের 'উত্তর পুরুষ'। বাংলাদেশে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের অত্যাচার এবং প্রতিষ্ঠাচিত্রণ-সূত্রে এ-উপন্যাসে ফুটে উঠেছে আরাকান-রাজ সন্দ-সুধর্মার অত্যাচারের কাহিনী, প্রীতিলতা ওরাদ্দেদারের বীরত্বের কথা, পর্তুগীজদের গোয়া-হুগলী-চট্টগ্রাম দখলের ইতিহাস। এ-উপন্যাসের ব্যতিক্রমী চরিত্র বনি, যে পর্তুগীজ নাগরিক হয়েও, বাংলাদেশকে দ্বিতীয় স্বদেশ হিসেবে গ্রহণ করেছে, ভালোবেসেছে এদেশের শ্যামল প্রকৃতি আর শ্যামল মানুষকে এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে পর্তুগীজ অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে।

'বং থেকে বাংলা' উপন্যাসে রিজিয়া রহমান বাঙালির ইতিহাসসন্ধানী এবং একই সঙ্গে সমকালস্পর্শী। শ্রম-অধ্যবসায়-ইতিহাসজ্ঞান এবং শিল্প-চেতনার আন্তরমিলনে 'বং থেকে বাংলা' উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল শিল্পকর্ম। এখানে ইতিহাসকে তিনি স্বচ্ছন্দ-প্রয়াসে পরিণত করেছেন শিল্পে; এবং শিল্পের দাবীতেই, সঙ্গতকারণে, ইতিহাসের ধূসরতায় মিশেছে কল্পনার সৌরভ। রিজিয়া রহমান এ-উপন্যাসে তুলে ধরেছেন শতাব্দী পরম্পরায় প্রবহমান এই ব-দ্বীপের অবহেলিত-উপেক্ষিত-অধিকারহীন মানুষের যাপিত-জীবন; আর সে-সূত্রেই এ-উপন্যাসে উঠে এসেছে বাঙালি জাতিগঠনের অতীত ইতিহাস। এ-প্রসঙ্গে লেখকের ভাষ্য:

> বাংলাদেশের জাতিগঠন ও ভাষার বিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে 'বং থেকে বাংলা' উপন্যাসের সৃষ্টি। ··· আড়াই হাজার বছর আগে বং গোত্র থেকে শুরু করে উনিশশ' একাত্তুরের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়কাল পর্যন্ত দীর্ঘ পরিব্যাপ্তির মধ্যে এ-উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস করা হয়েছে।··· বাংলার সিংহাসন চিরকাল বিদেশী

ক্ষমতালিপ্সু এবং সম্পদলোভীর দ্বারা শাসিত হয়েছে। বাংলার সাধারণ মানুষ চিরকালই অবহেলিত উপেক্ষিত এবং উৎপীড়িত। জাতি হিসেবে সামাজিক অর্থনৈতিক গণতান্ত্রিক মর্যাদা তারা কোনদিন পায়নি। 'বং থেকে বাংলা' যেমন একদিকে ইতিহাসের সঙ্গে সেই কথাটিই প্রকাশ করেছে, তেমনি কি করে সুদীর্ঘ দিনে একটি জাতি স্বাধীনতার মর্যাদায় এসে দাঁড়িয়েছে তারই চিত্রণের চেষ্টা করেছে। ৫০

ভারত উপমহাদেশের প্রান্ত-সীমায় অবস্থিত বেলুচিস্তানের স্বাধীনচেতা মানুষ, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী সামাজিক-অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক ভাবে বৈষম্যের শিকার, তাদের দেশ-প্রেম আর সাজাত্যবোধের গর্ব-গৌরব আর সাহসের অনুপম শিল্পরূপ রিজিয়া রহমানের উপন্যাস 'শিলায় শিলায় আগুন'। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বেলুচিস্তানের বিদ্রোহ ও কালাতের যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হয়েছে এ-উপন্যাস। তবে লেখকের সচেতন শিল্পদৃষ্টির স্পর্শে, এক বেলুচিস্তানের কাহিনীর আধারে, এখানে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী শোষিত মানুষের সংগ্রাম-সাহস আর স্বপ্নের কথা।

রিজিয়া রহমানের 'রক্তের অক্ষর' নিষিদ্ধ পল্লীর যন্ত্রনাদগ্ধ প্রাত্যহিকতার ভাষাচিত্র; আর 'ধবল জোৎস্না' হচ্ছে তরঙ্গ-উত্তাল সুনীল বঙ্গোপসাগরের হাঙর-শিকারী জেলে, রবার বাগানের শ্রমিক আর পাহাড়ী ঝর্ণায় পা ডুবিয়ে অন্য-জীবন প্রার্থনা করা এক মেয়ে—এদের আধারে, সাগরতীরের মানুষের ধবল বেদনা আর রূপালি স্বপ্নের শিল্পরূপ। বিন্দিয়া-লছমী-শিউরাম-অর্জুন-হরমতী-চন্দনী-রাজিন্দর-হরিয়া আর চামেলী—এই সব চা-পাতা সংগ্রহকারীদের প্রতিদিনের জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে রিজিয়া রহমানের 'সূর্য সবুজ রক্ত'। উপন্যাসের সমাপ্তিতে 'চামেলীর হাতের রক্ত ঝরে বাংলাদেশে, ভারতে, শ্রীলঙ্কায়'—এমন একটি মাত্র বাক্য জুড়েই রিজিয়া রহমান প্রকাশ করে দেন তাঁর আন্তর্দেশিক চেতনা।

বিষয়-ভাবনায় বিশিষ্ট রিজিয়া রহমানের উপন্যাস 'অলিখিত উপাখ্যান'। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের নিষ্পেষণে ক্লিষ্ট অত্যাচারিত বাঙালির

আর্তনাদ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে (১৮৩৮-৯৪) আলোড়িত করেছে ; কিন্তু প্রতিবাদের কলম উত্তোলন করতে গিয়েও 'মানুষ' বঙ্কিম—'সাহিত্যিক' বঙ্কিম পরাজিত হয়েছেন 'ডেপুটি' বঙ্কিমের কাছে। সেই সত্য-অন্বেষী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর অভিলাষ আর অক্ষমতার মর্মবেদনা নিয়ে গড়ে উঠেছে এ-উপন্যাস।

উত্তর বাংলার সাঁওতাল-জীবন নিয়ে লেখা রিজিয়া রহমানের 'একাল চিরকাল' এক মহাকাব্যিক উপন্যাস। এ-উপন্যাস ধারণ করেছে সাঁওতাল জনপদের সুদীর্ঘ কাল, এবং এখানে আছে সাঁওতালদের আনন্দ-বেদনা, প্রত্যাশা-প্রাপ্তি, ধর্মবিশ্বাস-কুসংস্কার, শোষণ-বঞ্চনা এবং ঈর্ষা আর স্বার্থ-পরতার ছবি। এই আরণ্যক আদি-মানুষের জীবন সভ্যতার স্পর্শে এক সময় বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে :

> প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারের নীলাভ কুয়াশা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে মানুষ হড়। হড়রাই সেই নীলাভ অন্ধকারের পবিত্রতা দু'হাতের মুঠোয় ভরে ছড়িয়ে দেয় চারিদিকে। আর অনেক দূর থেকে শংখিনী সাপের আঁকা বাঁকা দেহভঙ্গীর কুটিলতা নিয়ে পথ খোঁজে খোঁজে এগিয়ে আসে সভ্যতা।[৫১]

আদিম জনপদের এই বিপর্যয়েরই শিল্পরূপ 'একাল চিরকাল'। ভাষার ক্লাসিক সংহতি, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, ইতিহাসনিষ্ঠা, সমাজ-সচেতনতা এবং শৈল্পিক সতর্কতা—সবকিছুর অন্তর্মিলনে রিজিয়া রহমানের এ-উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যের এক বিশিষ্ট সংযোজন।

সেলিনা হোসেনেরও যাত্রা-শুরু স্বাধীনতা-উত্তর কালে এবং ইতোমধ্যে তিনি লিখেছেন এ-সব উপন্যাস : 'জলোচ্ছ্বাস' (১৯৭২), 'জোৎস্নায় সূর্য-জ্বালা' (১৯৭৩) 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৭৬), 'মগ্ন চৈতন্যে শিস' (১৯৭৯), 'যাপিত জীবন' (১৯৮১), 'নীল ময়ূরের যৌবন' (১৯৮৩), 'পদশব্দ' (১৯৮৩) এবং 'চাঁদবেনে' (১৯৮৪)। বিষয়-গৌরবে সেলিনা হোসেনের প্রতিটি উপন্যাসই স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষরবাহী। দক্ষিণবাংলার চরজীবন-ভিত্তিক 'জলোচ্ছ্বাস' উপন্যাসে লোকমানসের সঙ্গে স্রষ্টার সুগভীর সংযোগ অভি-ব্যঞ্জিত হয়েছে। 'জোৎস্নায় সূর্যজ্বালা' উপন্যাস নাগরিক-ক্লেদ আর অবক্ষয়ী

জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির অভিলাষী গ্রামীণ স্নিগ্ধতায় বেড়ে ওঠা বস্তিবাসী এক নারীর আপন উৎসে প্রত্যাবর্তনের শব্দচিত্র। তাঁর 'মগ্ন চৈতন্যে শিস' নৈঃসঙ্গ্য-পীড়িত এবং স্মৃতিভারাক্রান্ত আধুনিক মানুষের অন্তর্ময় ভাবনার শব্দরূপ; তা কর্মহীন মধ্যবিত্তের গীতল প্রেম-উপাখ্যান। একজন মিতুলকে না-পাবার বেদনার উপন্যাসের নায়ক জামেরী এখানে হারিয়ে যায় অসীম নৈঃসঙ্গ্য আর অতলান্ত শূন্যতায়।

বিষয়-গৌরবে বিশিষ্ট সেলিনা হোসেনের 'যাপিত জীবন'। ১৯৪৭-এর দেশ-বিভাগ থেকে শুরু করে ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সংক্ষুব্ধ সময়ের পটভূমিতে রচিত এ-উপন্যাসে ঘটনার দ্বৈত স্রোতধারায় বিন্যস্ত হয়েছে সমাজসত্য এবং ব্যক্তি-সংবেদনা। কিন্তু অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতার জন্যে গৌরবোজ্জ্বল পটভূমিকে ধারণ করা সত্ত্বেও এটি শৈল্পিক সিদ্ধিকে অঙ্গীকার করতে পারেনি। প্রেম আর সংগ্রামের দ্বৈরথে নায়ক জাফর রক্তাক্ত হয়েছে এবং অবশেষে নতুন ভোরের প্রত্যাশায় সে সংগ্রামের স্রোতে মিলে গেছে। 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসে ধরা পড়েছে সেলিনা হোসেনের ঐতিহ্য-প্রীতি। এ-উপন্যাসে তিনি বিচরণ করেছেন হাজার বছর পূর্বের চর্যাগীতির উঠানে। ইতিহাসনিষ্ঠা, সমাজসচেতনতা এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির অঙ্গীকারে রচিত এ-উপন্যাস হাজার বছর পূর্বের বাংলাদেশ আর বাঙালি জাতির এক শাব্দিক দলিল।

'মনসামঙ্গলে'র সাহিত্যিক ঐতিহ্য এবং সমকালের জীবন অভিজ্ঞতা—এ' দুয়ের পরস্পর অন্তর্বয়নে রচিত হয়েছে সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেনে' উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক চাঁদবেনে 'মনসামঙ্গল' কাব্যের সাহসী-মানুষ চাঁদ সদাগরের নবীন সংস্করণ। কাহিনীর মৌল-উৎসে আছে 'মনসামঙ্গলে'র অনুষঙ্গ; তবে কেবল 'মনসামঙ্গলে'র আবহেই 'চাঁদবেনে' সীমাবদ্ধ নয়—বরং মঙ্গলকাব্যের ধূসর পাতা ছিঁড়ে, চাঁদ সদাগরের প্রেরণায়, এখানে ফুটে উঠেছে এক ভূমিহীন শোষিত ক্ষেত-মজুরের জীবনযন্ত্রণা ও জীবনসংগ্রামের কাহিনী। এ-উপন্যাসে পূজা-প্রার্থী ভয়ঙ্কর এক রাক্ষুসী মনসা নেই—তবে আছে মনসারূপী এক ভূস্বামী শোষক আজু মৃধা। মঙ্গলকাব্যের যুগে দেবতাপ্রত্যয়ী সমাজে সবার অলক্ষ্যেই যেমন জন্ম নেয় একজন বেপরোয়া চাঁদ সদাগর, যার কণ্ঠে উঠে-আসে দেবতার বিরুদ্ধে অকল্পনীয় প্রতিবাদ—

'আমি তেত্রিশ কোটি দেবতা মানিনা, কোন অপদেবতার পূজা আমি দেব না' ; তেমনি চম্পাইগঞ্জের অবরুদ্ধ সমাজ-প্রতিবেশে ভূমিহীন শোষিত ক্ষেত-মজুরের ঘরে জন্ম নেয় একজন বেপরোয়া চাঁদবেনে—যার কণ্ঠে চাঁদ সদাগরের মতই প্রতিবাদ-ধ্বনি—"আমি আজু মৃধার শোষণ থেকে মুক্তি চাই, আমি তাকে ঘৃণা করি, আমি তাকে প্রতিদ্বন্দী মনে করি।" তবে উপন্যাসের পরিণতিতে 'লাউয়ের ডগার মতো' এক সকিনার আকাঙ্ক্ষায় চাঁদবেনের এই সংগ্রামীসত্তা আর সমাজভাবনা প্রেমের কাছে পরাভব মানলো :

> আজু মৃধা আমার ভিটে দখল করে নিলে আমি লড়াই করবো, পরাজিত হলে বিন্দুমাত্র গ্লানি আমাকে আচ্ছন্ন করবেনা। সেই শোক লালন করে আমি আবার প্রস্তুতি নেবো। কিন্তু একজন প্রিয়তম নারীর অভাব কাটিয়ে উঠতে পারবো না। যে নারী উর্বরা ভূমি হয়ে উত্তর-পুরুষ সৃষ্টি করে। যার ক্ষমতায় জীবনের ফসল উপচে ওঠে। যার ভালোবাসায় চম্পাইগঞ্জের মাটিতে সুদিন আসে।[৫২]

এ-উপন্যাসে লেখকের সমাজতাত্ত্বিক ভাবনা যেমন বহির্জীবনসন্ধানী ; তেমনি মানুষের বিচ্ছিন্নতা ও নৈঃসঙ্গ্য-উন্মোচন যেন অতল হৃদয়স্পর্শী। পরিচর্যা-সচেতনা, উপমা-উৎপ্রেক্ষায় ইঙ্গিতময়তা এবং কবিতাস্পর্শী ভাষারীতি সেলিনা হোসেনের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইতিহাস এবং ঐতিহ্য, কখনো কখনো প্রতিভার স্পর্শে, নবতর জীবন-চেতনায় স্পন্দিত হয়ে ওঠে। সমকাল-চঞ্চল জীবনাবেগ এবং যুগ-সংক্ষোভ অঙ্গীকার করে মহৎ শিল্পীমানস ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আধারে সঞ্চার করে নবীন সংবেদনা। লেখকের চেতনার গভীরে প্রোথিত ইতিহাসজ্ঞান এবং সমাজবোধের স্পর্শে ইতিহাস এবং ঐতিহ্যিক উপাদানের পুনর্জন্ম ঘটে ; কল্লোলিত বর্তমানের অভিজ্ঞতার উত্তাপে ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্তর্বয়নে মিলে যায় একালের সাথে চিরকাল। শৈলিপক সিদ্ধির প্রশ্ন উঠতে পারে, তবু একথা অনস্বীকার্য যে, শওকত আলী, রিজিয়া রহমান, সেলিনা হোসেন প্রমুখ ঔপন্যাসিক ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে অঙ্গীকার করে

যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের উপন্যাস-সাহিত্যে সঞ্চার করেছেন একটি নতুন মাত্রা। তবে তুলনাসূত্রে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যিক উপাদানের উপন্যাস-অবয়ব সৃষ্টিতে এঁদের মধ্যে রিজিয়া রহমানের সাফল্য একক, বিস্ময়কর, অনতিক্রান্ত এবং শীর্ষবিন্দুস্পর্শী।

স্বাধীনতা-উত্তরকালের আরেকজন প্রতিশ্রুতিশীল ঔপন্যাসিক হুমায়ুন আহমেদ (১৯৪৮-)। তাঁর উপন্যাসগুলো হচ্ছে—'নন্দিত নরকে' (১৯৭২), 'শঙ্খনীল কারাগার' (১৯৭৩), 'তোমাদের জন্য ভালোবাসা' (১৯৭৪), 'অচিনপুর' (১৯৭৪), 'নির্বাসন' (১৯৭৪), 'শ্যামল ছায়া' (১৯৭৩), 'অন্যদিন' (১৯৮৪), 'সৌরভ' (১৯৮৪), 'তোমাকে' (১৯৮৪) এবং 'ফেরা' (১৯৮৪)। একদা 'নন্দিত নরকে' এবং 'শঙ্খনীল কারাগার' লিখে তিনি ব্যাপক আলোচিত হয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে, তিনি আত্ম-সমর্পণ করলেন সহজ ফুলেল জনপ্রিয়তার কাছে এবং লিখে ফেললেন উপন্যাসের অভিধায় একগুচ্ছ বড়গল্প। সোমেন চন্দের (১৯২০-১৯৪২) বিখ্যাত 'ইঁদুর' গল্পের অনুপ্রেরণায় তিনি রচনা করেন 'নন্দিত নরকে' এবং 'শঙ্খনীল কারাগার'—এমন স্বীকারোক্তি 'শঙ্খনীল কারাগারে'র ভূমিকায় উল্লেখিত হয়েছে।[৫৩] কিন্তু সোমেন চন্দের গল্পে সুগভীর এবং সীমাংসিত সমাজবাদী চেতনা[৫৪] হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাসে অভিব্যঞ্জিত হয়নি। যুদ্ধোত্তর সময়ে বিপর্যস্ত মূল্যবোধে আচ্ছন্ন 'নরক' আর 'কারাগার' থেকে হুমায়ুন আহমেদ মুক্তির অভিলাষী; কিন্তু ঐ 'নরক' আর 'কারাগার' থেকে এলো না তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি — বরং 'নন্দিত' আর 'শঙ্খনীল' বিশেষণের আবরণে মেনে নেন তিনি স্বেচ্ছাবন্দিত্ব। আমরা জানি, উপন্যাসের অন্বিষ্ট পূর্ণায়ত জীবন, কিন্তু হুমায়ুন আহমেদের পরবর্তী উপন্যাসসমূহে সেই পরিপূর্ণ অখণ্ড জীবন-উপলব্ধি নেই। যেমন হুমায়ুন আহমেদ, জনপ্রিয়তার কাছে সমর্পিত হয়ে, লিখছেন একগুচ্ছ বড়গল্প; তেমনি আরেকজন ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলনও (১৯৫৫-) উপন্যাসের অভিধায় লিখেছেন বেশ কিছু বড়গল্প[৫৫] এবং এখানেও জীবনজিজ্ঞাসা খণ্ডিত ও বয়োসন্ধি-স্নিগ্ধ। স্বাধীনতা-উত্তর কালে, এ-ছাড়াও, আরো কয়েকজন নতুন ঔপন্যাসিকের আগমন ঘটেছে, যাঁরা বিষয়ভাবনা এবং আঙ্গিক-নির্মিতির প্রশ্নে পরীক্ষা প্রবণ এবং স্বাতন্ত্র্য অর্জনের প্রয়াসী; তবু তাঁদের সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কিছু বলার এখনো সময় হয়নি।

পাঁচ

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা তুলে ধরেছি পূর্ববাংলার উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি, দেখাতে চেয়েছি আমাদের ঔপন্যাসিকদের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা। প্রাক্-সাতচল্লিশ পর্বে গ্রামমুখীন জীবনযাত্রার রূপায়ণে আমাদের প্রবীণ ঔপন্যাসিকরা যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তা নির্মাণ করেছে পূর্ববাংলার উপন্যাস-সাহিত্যের ভিত্তি। পঞ্চাশের দশকে আমাদের উপন্যাসে এলো নগরজীবন—এলো প্রতিবাদ-প্রতিরোধের শব্দস্রোত। ষাটের দশকে এসে উপন্যাস-সাহিত্যে প্রাধান্য পেল অবক্ষয়ী মূল্যবোধ, এলো আঙ্গিক-সচেতনা এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্য-অনুসরণে উপন্যাস রচনার একটি নতুন ধারা। মুক্তিযুদ্ধোত্তর উপন্যাসে এলো বিষয়বৈচিত্র্য, কিন্তু ক্রমঅপসৃত হলো মৃত্তিকাসংলগ্ন মানুষেরা — উপন্যাসের শব্দস্রোতে কল্লোলিত হলো না বাঙালি জাতিসত্তার রক্তাক্ত উজ্জীবন।

যুগের হতাশা, নৈরাজ্য, অবক্ষয়, কর্মহীন রোম্যান্টিকতার অকারণ যন্ত্রণা আর মৈথুন-উৎসবের চিত্র নয়—আমরা চাই তেমন একটি উপন্যাস, যেখানে আছে দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কথা। অন্তঃসারশূন্য মধ্যবিত্তের অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জনের কাব্যিক বর্ণনা নয়, আমরা চাই উত্তরণের কথামালা। ভীরুতা, কাপুরুষতা আর রমণপ্রিয়তার চিত্র নয়—আমরা চাই তেমন একটি উপন্যাস যেখানে আছে নাম জানা না-জানা হাজার-লক্ষ বীর শহীদের রক্তদান-মহোৎসবের কথা। আমরা বিশ্বাস করি, সমাজচৈতন্য ও ব্যক্তিসংবেদনার অন্তর্মূল থেকে উৎসারিত, প্রার্থিত সেই উপন্যাসটি আমাদের উজ্জীবিত করবে উজ্জ্বল উত্তরণের লক্ষ্যে; নতুন চেতনায় স্পন্দিত হয়ে উঠবে নষ্ট জীবনের আরাধনারত তরুণ সমাজ—হয়ে-উঠবে তারা রক্তমুখী, সূর্যমুখী, স্বপ্নমুখী। আমরা আশা করবো, একাত্তরের রক্তাক্ত উজ্জীবনের আলোয় পথ দেখে আমাদের ঔপন্যাসিকরা এগিয়ে আসবেন উত্তরণ আর শৃঙ্খলমুক্তির কথামালা সৃষ্টিতে—হয়ে উঠবেন তাঁরা এক একজন নতুন মুক্তিযোদ্ধা।

তথ্যনির্দেশ

১ Ralph Fox : *The Novel and the People*, 1937, Lawrence & wishart, London, P. 7

২ সৈয়দ আকরম হোসেন : 'বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্প-জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ', সাহিত্য পত্রিকা (সম্পাদক : প্রফেসর নীলিমা ইব্রাহিম), সপ্তদশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা (শীত ১৩৮০), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১৬

৩ মোহাম্মদ নজিবর রহমান : আনোয়ারা, ১৯১৪, ত্রয়োদশ মুদ্রণ—১৩৮১, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, পৃ. ২৪২

৪ কাজী ইম্‌দাদুল হক : আবদুল্লাহ্‌, ১৯৩৩, ৪র্থ সংস্করণ—১৯৬২, বি. এফ. এইচ. পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ. ২৫২

৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'নদীবক্ষে' উপন্যাসের প্রথমে মুদ্রিত।

৬ আনোয়ার পাশা : সাহিত্যশিল্পী আবুল ফজল, ১৯৬৭, বইঘর, চট্টগ্রাম, পৃ. ৬৬

৭ উদ্ধৃত—আবুল ফজল রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), ১৩৮২, বইঘর, চট্টগ্রাম, পৃ. ৯৬৩-৬৪

৮ সৈয়দ আকরম হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

৯ আবুল ফজল : প্রদীপ ও পতঙ্গ, আবুল ফজল রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮

১০ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : 'পূর্ব পাকিস্তানী কথা-সাহিত্য,' আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ১৯৬৫. বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৩৬

১১ 'জননী' ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হলেও, এ-উপন্যাসটি লিখিত হয়েছে চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে, দ্রষ্টব্য-'মুখবন্ধ'।

১২ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ : লালসালু, ১৯৪৮, ষষ্ঠ স.—১৯৬৭. কথাবিতান, ঢাকা, পৃ. ৩০

১৩ লেখক পরবর্তীকালে উপন্যাসটির নাম রাখেন 'দুই মহল'।

১৪ হাসান আজিজুল হক : 'পূর্ব পাকিস্তানের কথাসাহিত্যে চিন্তার সংকট', "পরিক্রম" (সম্পাদক : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও রফিকুল ইসলাম), তৃতীয় বর্ষ : নবম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৬৪, ঢাকা, পৃ. ৪৯৯

১৫ শওকত ওসমান : সমাগম, ১৩৭৪. কথাকলি, ঢাকা, পৃ. ১৪৫-৪৬

১৬ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ : কাঁদো নদী কাঁদো, ১৯৬৮, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, পৃ. ২৪৪-৪৫

১৭ সৈয়দ আকরম হোসেন : 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস', "শব্দরূপ" (সম্পাদক : সৈয়দা হাফসা বেগম), তারিখবিহীন, ঢাকা, পৃ. ১২

১৮ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮-৩৯

১৯ সরদার জয়েনউদ্দীন: অনেক সূর্যের আশা, ১৯৬৭, বইঘর, চট্টগ্রাম, পৃ. ৩৪৭

২০ এক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যতিক্রম আলাউদ্দিন আল-আজাদের 'ক্ষুধা ও আশা' এবং **'কর্ণফুলী'**।

২১ হাসান হাফিজুর রহমান: 'আমাদের সাহিত্য: বিভ্রান্তি উৎক্রান্তি', "সমকাল" (সম্পাদক: সিকান্দার আবু জাফর), ষষ্ঠ বর্ষ: দশম সংখ্যা, জৈষ্ঠ্য ১৩৭০, পৃ. ৬৬৯

২২ আলাউদ্দিন আল-আজাদ: শিল্পীর সাধনা, ১৯৫৮, চতুর্থ সংস্করণ—১৯৭৪, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ. ৬৮

২৩ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৭৬, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, পৃ. ৩৯২-৯৩

২৪ সৈয়দ শামসুল হক: সীমানা ছাড়িয়ে, ১৯৬৪, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৪১

২৫ দ্রষ্টব্য: 'সারেং বৌ'-এর প্রথম সংস্করণের পিছনের মলাটে মুদ্রিত পরিচিতি। তবে এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩-১৯৭৬) সারেং জীবনভিত্তিক ছোটগল্প, 'সারেঙ' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। 'অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের স্ব-নির্বাচিত গল্প' (১৩৬১, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি., কলকাতা) গ্রন্থে গল্পটি সংকলিত হয়েছে।

২৬ শহীদুল্লা কায়সার: সারেং বৌ, ১৯৬২, তৃতীয় সংস্করণ—১৯৬৮, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, পৃ. ১৪৭

২৭ শহীদুল্লা কায়সার: সংশপ্তক, ১৯৬৫, পূর্বাণী, ঢাকা, পৃ. ৫৩৬

২৮ সত্যেন সেন: পুরুষমেধ, ১৯৬৯, সুচয়নী, ঢাকা, দ্রষ্টব্য— 'অবতরণিকা'।

২৯ এ-প্রসঙ্গে 'পাপের সন্তান' উপন্যাসের ভূমিকায় লেখকের ভাষ্য:

> 'পাপের সন্তান'কে আমার 'অভিশপ্ত নগরী' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড বলা চলে। এই দুটি উপন্যাসের ঘটনা-কালের ব্যবধান অর্ধ-শতাব্দীর কিছু উপর।

৩০ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়: কালের প্রতিমা, ১৯৭৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৩৯৫

৩১ জহীর রায়হান: আর কতদিন, ১৯৭০, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৪৭-৪৮

৩২ জহীর রায়হান: আরেক ফাল্গুন, ১৯৬৯, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৬৮

৩৩ এ-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য: ওয়াকিল আহমদ: 'আনোয়ার পাশার জীবনকথা', মুনীর চৌধুরী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী আনোয়ার পাশা (সম্পাদক: সৈয়দ আকরম হোসেন), ১৯৭২, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১১১-১৪

৩৪ সৈয়দ আলী আহসান: দ্রষ্টব্য--'নোঙর' উপন্যাসের ভূমিকা।

৩৫ হাসান হাফিজুর রহমান: 'দুটো পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস', সাহিত্য-প্রসঙ্গ, ১৯৭৩, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৭৭, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ. ৭৪

৩৬ আনিসুজ্জামান: 'ইতিহাস ও উপন্যাস', "পরিক্রম" (সম্পাদক: সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও রফিকুল ইসলাম), তৃতীয় বর্ষ: তৃতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ২৬৮

৩৭ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান: 'আমাদের উপন্যাস প্রসঙ্গে', "উত্তরাধিকার" (সম্পাদক: ডক্টর মযহারুল ইসলাম), শহীদ দিবস সংখ্যা-১৯৭৪; দ্বিতীয় বর্ষ: প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩৮ আনোয়ার পাশা: রাইফেল রোটি আওরাত, ১৯৭৩, বর্ণমিছিল, ঢাকা, পৃ. ২২৯

৩৯ শওকত আলী: যাত্রা, ১৯৭৬, বইঘর, চট্টগ্রাম, পৃ. ৯১

৪০ উপন্যাসটি এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। পত্রিকায় প্রকাশ—"উত্তরাধিকার" (সম্পাদক: মনজুরে মওলা), ১২শ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩০-১০৪

৪১ সৈয়দ শামসুল হক: দ্বিতীয় দিনের কাহিনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

৪২ সৈয়দ শামসুল হক: দ্বিতীয় দিনের কাহিনী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

৪৩ সেলিনা হোসেন: হাঙর নদী গ্রেনেড, ১৯৭৬, দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৮৪, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ. ১৫৯

৪৪ রশীদ হায়দার: নষ্ট জোছনায় এ কোন অরণ্য, ১৯৮২, ত্রয়ী, ঢাকা, পৃ. ২৫

৪৫ দ্রষ্টব্য: মাহমুদুল হক: জীবন আমার বোন, ১৯৭৬, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৯৪-৯৫

৪৬ হারুন হাবীব: প্রিয়যোদ্ধা, প্রিয়তম, ১৯৮২, তারুণ্য প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৫৭

৪৭ শওকত আলী: প্রদোষে প্রাকৃতজন, ১৯৮৪, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, পৃ. ২৪১

৪৮ See: Aristotle: *On the Art of Poetry*, '*Classical Literary Criticism*', Translated by T. S. Dorsch, Penguin Books, London, Pp. 43-45

৪৯ দ্রষ্টব্য: আনিসুজ্জামান: 'প্রদোষে প্রাকৃতজন' উপন্যাসের ফোল্ডারে মুদ্রিত পরিচিতি।

৫০ রিজিয়া রহমান: বং থেকে বাংলা, ১৯৭৮, মুক্তধারা, ঢাকা; ভূমিকা দ্রষ্টব্য, পৃ. (২২)

৫১ রিজিয়া রহমান: একাল চিরকাল, ১৯৮৪, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ. ৯

৫২ সেলিনা হোসেন: চাঁদবেনে, ১৯৮৪, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৮১

৫৩ এ-প্রসঙ্গে লেখকের ভাষ্য :

সোমেন চন্দের লেখা অসাধারণ ছোটগল্প 'ইঁদুর' পড়ার পরই নিম্ন-মধ্যবিত্তদের নিয়ে গল্প লেখার একটা সুতীব্র ইচ্ছা হয়। 'নন্দিত নরকে', 'শঙ্খনীল কারাগার' ও 'মনসুবিজন' নামে তিনটি আলাদা গল্প প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লিখে ফেলি।

দ্রষ্টব্য : হুমায়ুন আহমেদ : শঙ্খনীল কারাগার, ১৩৮০, চতুর্থ মুদ্রণ—১৩৮৯, খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানী, ঢাকা।

৫৪ এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় 'ইঁদুর' গল্প সম্পর্কে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের মন্তব্য :

সোমেন চন্দের নাম জানা ছিল, কিন্তু তাঁকে কখনও দেখিনি, কিংবা তাঁর কোন লেখা পড়িও নি। পার্টি যখন আইন-সম্মত হল তখন বাইরে এসে সোমেন চন্দের লেখা 'ইঁদুর' গল্পটি পড়লাম। আমার মন তখন হাহাকার করে উঠল। হায় হায়, এমন ছেলেকে রাজনীতিক মনকষাকষির জন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা মেরে ফেলল! সোমেন বেঁচে থাকলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি বিরাট স্তম্ভ গড়ে তুলতে পারতেন।···এই গল্প (ইঁদুর) পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক তা পড়েছেন। 'ইঁদুর' জগতের একটি শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প।

দ্রষ্টব্য : মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ : সোমেন চন্দ ও তাঁর রচনা সংগ্রহ (সম্পাদক : দিলীপ মজুমদার, ১৯৭৩, দ্বি. স. ১৯৭৮, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা) গ্রন্থের 'মুখবন্ধ'।

৫৫ ইমদাদুল হক মিলনের উপন্যাসোপম রচনাসমূহ: 'দুঃখকষ্ট' (১৯৮২), 'ও রাধা ও কৃষ্ণ' (১৯৮২), 'মহাযুদ্ধ' (১৯৮২), 'এক দেশে...' (১৯৮২) 'ভালোবাসার পাশেই' (১৯৮৩), 'কালোঘোড়া' (১৯৮৩), যাবজ্জীবন (১৯৮৩), 'উপনায়ক' (১৯৮৩) এবং 'ভূমিপুত্র' (১৯৮৪)।